

Sri Sri Dinabandhu Bani
Mahatmya
1930

Sas.
Librarian

Uttarpara Joykrishna Public Library
Govt. of West Bengal

অনুক্রমণিকা ।

যাঁহার পুণ্য আবির্ভাবে সমস্ত বিশ্বে ওলট পালট পরিবর্তন
ও নব জাগরণের মহাভাব সমুপস্থিত, জগতের এক প্রাপ্ত হইতে
অন্য প্রাপ্ত, পর্য্যন্ত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রেরণায় সমস্ত
জাতি সমস্ত মানবমণ্ডলী উষ্ম, যাঁহার শ্রীমুখ হইতে সনাতন
বৈদান্তিক, ধর্ম্মভাব সমূহ অনাবিল প্রস্রবণবৎ প্রবাহিত হইয়া
মহামুখকে মহাজ্ঞানীর গুরু এবং বিদ্বান মণ্ডলীকে বিন্মিত
কৃত্তিত করিয়াছে ; এবং ভক্তহৃদয়কে ঐ ভাব প্রবাহে নিমজ্জিত
করিয়া আনন্দে পাগল করিয়া তুলিয়াছে,—তাঁহার সেই অমৃতময়
রস “বেদবাণী” শুনিবার জষ্ঠ্য কাহার প্রাণ না ব্যাকুল হইবে ?

শ্রীনি নিজে স্নানী হইয়াও মুখকে স্নান, বুভুকুকে অন্ন, বস্ত্র-
হীনকে বস্ত্র এবং রুগ্নকে ঔষধ দ্বারা সহস্র সেবা করিয়া দরিদ্র
সেবার সেবার যে মহান আদর্শবিধি দেখাইয়া গিয়াছেন,
বাহুবলবানিতা এমন কি আত্মসন্তুস্ত পর্য্যন্ত যাঁহার মহান
বিত্র, অহৈতুকী প্রেম পীযুষ দ্বারা স্নাত, স্নানিত হইয়াছে ; যাঁহার
মূল্য জীবনের অর্থে কাল সহস্র সহস্র বৎসরের নির্যাত্তাত্ত

মাতৃজাতির জন্ত মাতৃভাবে কাটিয়া গিয়াছে,—সেই
সেই মহা প্রেমোজ্জ্বল স্বরূপ, সেই দীন দুঃখীর প্রাণের
র ঠাকুরের জ্ঞানের কথা, প্রেমের কথা, প্রাণের
রিতে সকলেই আগ্রহান্বিত উৎকণ্ঠিত জানিয়া তাঁহার
গী সমূহের কিয়দংশ সঙ্কলন করিতে এই দীনজনের
প্রতিবেদ্য ।

যে সাধুগণের প্রতি ছক্কারে মেদিনী কল্পিত হইত, আত্মকে
শব্দসমূহ, বাইস, মহাশয়কার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত সেই

মহাবীৰ্য্য স্বরূপ ওজোম্বরূপ, ক্ষাত্ৰশক্তি ব্রহ্মতেজঃ স্বরূপ অবতীর্ণ
 হোমেন্দ্রের মহাশক্তি প্রকাশ করিতে তাঁহার লক্ষ লক্ষ ভক্তের
 অনুরোধে অক্ষম হইলেন ও তাঁহার অমূল্য ভাবগুলি গ্রন্থিত করিয়া
 প্রকাশ করিতে আমাকে বাধ্য করিয়াছে। এই অপূৰ্ণভাবের
 পাগল মানুষকে উগবান শ্রীকৃষ্ণের কেন্দ্রাবতার ভাষিয়া শিক্ষিত
 অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমান কৃষ্টিয়ান জাতিবর্ণ নির্বিশেষে বাংলার
 লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁহার শ্রীমূর্তির নিত্য পূজা করিয়া আসিতেছেন।
 তাঁহার স্থূলভাবে বর্তমানে তাহারা তাঁহার অমিয় প্রাণভোলা
 কথা শুনিয়া মধুর আত্মহারা আনন্দের সঙ্গ পাইয়া ধনা হইয়াছেন
 এইক্ষেণে তাঁহার স্থূলভাবে সঙ্গলাভের অভাবে বহু ভক্তই তাঁহার
 “বাণী ও “লীলা মহাত্মা” গ্রন্থ সঙ্গ পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া
 পড়িয়াছেন। তাঁহার কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত সম্মিলিত ভাবে
 তাঁহার “লীলামহাত্মা” গ্রন্থ লিখিতেছেন। এবং ভক্ত কবিগণ
 বিরচিত তাঁহার “গীত-মহাত্মা” গ্রন্থ ও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
 এ ক্ষেত্রে জনসাধারণে তাঁহার লীলার মোটামুটি ভাবে সূচাপত্র
 হইতেও অতি সংক্ষিপ্তাকারে ১৯৩৫ বঙ্গাব্দের মাঘী পূর্ণিমা
 দ্বারেন্দ্রনগর মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকাশ্য মহোৎসবে দেশ সেবায়
 সর্বব্যাগী চির-কোমারতাবলম্বী মহাপুরুষ নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
 “ঠাকুর শ্রীশ্রীদীনবন্ধু দেব” সম্বন্ধীয় বক্তৃতা হইতে তাঁহার
 সংক্ষিপ্ত জীবনী নামে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করা গেল।
 এবং প্রথম পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি শ্রীমূর্তির ফটো প্রদ-
 ৰ্শিত হইল। ভুল ভ্রটি অনেক রহিয়া গেল। তাঁহার নামে
 হাজার কথায় অব্যবহৃত শাস্তি বর্ধিত হয়, সেই মানুষের কথায়
 গুণেই তাঁহার ভক্ত সমাজে আশা করি সমস্ত অক্ষমতার ভ্রটি
 উপেক্ষিত হইবে। অসঙ্গতি বিস্তারেন ওমিতি।

সূচীপত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা
অবতার—	
অবতারের আবির্ভাব হয় কেন ...	১
উহার স্বরূপ ...	৬
অবতার, পার্শদ, ভক্ত, সিদ্ধপুরুষ ও সাধক সম্বন্ধেব ভিন্ন ভিন্ন ভাব ...	৬
ধর্ম কাহাকে বলে ...	৯
ধর্ম এক না বহু ...	৯
ধর্মের কয়েকটি সাধারণ সত্ত্ব ...	১০
প্রচার ...	১৩
কর্মযোগ বা কর্মরহস্য—কর্ম কি ...	১৪
কর্মের সবাই সমান ...	১৪
কর্মের শক্তি নেয়ে আসে ...	১১
কর্মের অনাসক্তিই আত্মতাগ, আত্মতাগই মুক্তি ...	১২
কর্মফল ...	১৩
বীৰ্য ও সত্যরক্ষা—	
বীৰ্যের উপর সত্য প্রতিষ্ঠিত ...	২২
বীৰ্য রক্ষা করায় উপায়, ঐ সময়ে নানাবিধ ...	২৪
সত্য মানুষকে দেবতা করে ...	২৫

বয়স :

পৃষ্ঠা।

জ্ঞান-যোগ—

আত্ম-বোধ ... ৩১

মায়ী ও মুক্তি ... ৩৫

গুণত্রয় ও জীবের অবস্থাভেদ ... ৩৯

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড ... ৪২

বিশ্বরূপ বা সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন ... ৪৬

ত্যাগ ও সেবা—

ত্যাগ ও ত্যাগের অধিকারী ... ৪৯

যথার্থ ত্যাগীৰ কৰ্ম্ম ... ৫১

আসক্তিই ভঃখ, ত্যাগই শাস্তি ... ৫২

ভাব না কেনে ভঙ্গি খৰা ভাল নয় ... ৫৪

ত্যাগ ও সেবা একই বস্তুব এদিক এদিক মাত্র ... ৫৫

সেবার স্বরূপ... ... ৫৬

সেবার চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হলে ... ৫৮

ভগবানকে পাওয়া যায় ... ৫৮

শুক ও সাধনা—

শুক কি ... ৬১

শুক গ্রহণ কৰতে হয় কেন ? ৭ ন পৰীক্ষা

করে নিতে হয় ... ৬২

শুক ও ভক্তের কর্তব্য ... ৬৬

সাধনা ও সাধনায় শুকব প্রয়োজন ... ৬৭

সাধনার অধিকারী কে ? সাধনার প্রকার ... ৬৮

যে যে পথ ধরেছে, ঋতুর থাক, অস্ত্রের পথে

বাধা দিও না ... ৭০

অসম্ভব কিছুই না, ঠোব ও পুরুষকার বলে

সবই সম্পন্ন হয় ... ৭২

বিশ্বাদ ... ৭৪

বয়স ।

নাম ও ধ্যান—

শব্দ শক্তি—নাম ত্রুষ্ণ ...

৭৬

নাম কেমন অবস্থায় কি প্রকারে নিতে হয়

৭৭

নামের সহিত ধ্যান বা যোগ ও সমাধির সম্বন্ধ

৮১

প্রেম-ভক্তি—

বৈরাগ্য ...

৮৩

ভক্তি, ভাব ও প্রেম ...

৮৫

কি প্রকারে ভক্তির সঞ্চার হয়

৮৫

ভক্তি অমূল্য ধন ...

৮৭

ভাব কত প্রকার, উহার লক্ষণ

৮৮

প্রেম, প্রেমের স্বভাবে ভক্ত ও প্রভু

৯৫

সাধু-সং—

সাধু ভক্তের লক্ষণ কিরূপ ...

১০৩

সাধু ও সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য ...

১০৬

সমাজ-তত্ত্ব—

সমাজ ও জাতি, উহার প্রয়োজনীয়তা

১০৮

বর্তমানে সমাজের কর্তব্য ...

১১১

মাহাজাতিকে সমান আসন দাও

১১২

ব্রাহ্ম বা বিবাহ ...

১১৩

স্বৈরশ্রমে বিবাহ ...

১১৪

ব্রহ্মচর্য পালন ...

১১৫

পরিচ্ছদ ...

১১৬

স্নানাহার ...

১১৭

বৈদিক ধর্মের পথে

ত্রি শ্রীচাকুরের কয়েকটি বাণী

১১৮

বিবিধ উপদেশ—

ভগবৎ কৃপা ...

১২৫

বর্তমান ...

১২৬

একটু ভাবো ...

১২৬

বিরাতের পূজা কর

১২৭

স্ব-ভাব সহসা ছাড়ি না	১২৮
সংসার ও সাধনা	১৩০
বসবার মত আসন না দিয়ে বসতে বসেও		
কি কেউ বসে	১৩১
রবিবাব	১৩২
মতে থেকে, মতে থাকা ভাল	১৩২
শক্তি অর্জন কর	১৩৩
প্রকৃত জগজ্জয়ী বীৰ	১৩৩
ভিক্ষা করা নিন্দনীয় কখন	১৩৪
প্রার্থনা	১৩৪
পরিশিষ্ট — শ্রীশ্রীদীনবন্ধু প্রণাম	১৩৫
শ্রীশ্রীদীনবন্ধু শরণ স্তোত্রাষ্টকম্	১৩৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী	১৩৭



ঠাকুর শ্রীশ্রীদয়ানন্দ দেব ।

শ্রীশ্রীদীনবন্ধু বাণী মাহাত্ম্য ।



অবতার ।

“যদা যদাহি ধর্মস্য গ্ৰানিভবতি ভারত ।

অবতারের আবির্ভাব অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্ ॥

হয় কেন ”

পরিত্ৰাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥”

কি আশার বাণী ! কি আনন্দের বার্তা !! যখন যখনই
ধর্মে গ্ৰানি উপস্থিত হ'বে, অধর্মের প্রাদুর্ভাব হ'বে, তখন তখনই
প্রভু ঈশ্বর প্রকাশিত হ'বেন ! তিনি সাধুদের ত্রাণের জন্ত আর
দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্ত, যুগে যুগেই এইরূপে জগতে এসে
থাকেন, তাঁর আগমনেতে সারা দুনিয়ায় তখন কুরুক্ষেত্র নেবে,
আসে, মহাবিপ্লব বেগায় জগৎ প্রাবৃত হ'য়ে যায় ; তারপর,
আবার নূতন জগৎ বের হয়ে আসে । নূতন যুগের শাস্ত্র শ্রী
ওপর নূতন, ধর্মের প্রতিষ্ঠান হয় ; জগৎ বহু কালের জন্ত
প্রশান্তি দ্বিত করে ।

ধর্ম্মে গ্লাপি উপস্থিত হয় কখন? যখন পারমার্থিক ও সামাজিক
 অনাতি ঘটে। তখন নীতি ও সম্পদ দুইই নষ্ট হ'য়ে যায়—
 নীতি নষ্ট হ'লে সম্পদ নষ্ট হয়, আবার সম্পদ নষ্ট হ'লে
 নীতিও নষ্ট হ'য়ে যায়। দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'লে
 সমাজনীতি কি ধর্ম্মনীতি কোন নীতিই আর থাকে না।
 উচ্চ শ্রেণীর-যারা খনে জনে খ্রানে শ্রেষ্ঠ, তারা নিম্ন
 শ্রেণীদের, যারা দরিদ্র দুর্বল মূর্থ তাদের ওপর এমন ভাবে
 কদৃষ্ণ হামবড়া ভাব জাহির করে যে তাদের “নাই”র
 মধ্যে যা আছে তা লুটতে থাকে। কারণ উচ্চশক্তি যখন
 যে দেশে যেরূপ ব্যবহার কতে থাকে, তখন সে দেশের
 হোট বড় সর্বপ্রকারের শ্রবল শক্তি, দুর্বল শক্তির ওপর
 সেইরূপ ব্যবহারই ক'রে থাকে। তাই তখন সমাজ থাকে
 না, সকলেই যার যার সুবিধামত চলতে থাকে, দেশ দেশের
 দিকে আর কেউ ফিরেও চায় না। সমাজ লুপ্ত হ'লে ধর্ম্ম আর
 দাঁড়াতে পার'পর? তিনিও অগৃহীত হন। ধর্ম্ম চ'লে যাওয়ার
 সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি ও লোপ পেতে বসে। পিতার স্মৃতি
 সম্বন্ধ রাখে না, পিতা পুত্রের প্রতি কর্তব্য ভূঁইয়া যায়। স্বামীস্ত্রী
 সম্বন্ধ, তাই ভগ্নী সম্বন্ধ, বন্ধু-বান্ধব গুরু-শিষ্য সকল লোকের
 সম্বন্ধই নষ্ট হ'য়ে যায়। পরস্পর সম্বন্ধ না থাকলে সৃষ্টি থাকেনা,
 এই সৃষ্টিধর বিশ্বপিতার ভাঙ্গাগড়া রূপ মীলা রহস্যের রস
 মাধুর্য্য থাকেনা। তাই তিনি চকল হ'য়ে উঠেন, এবং কোন
 এক মানব বা মানবী শরীর্মে প্রকাশ মুর্তিতে অবতীর্ণ হ'ন। তাঁর

গ্যাগমনে যে বিপ্লব আসে, তা সমস্ত পৃথিবীকে ভেঙ্গে
মামূল পরিবর্তন ক'বে, নৃত্য ক'রে গড়তে থাকে। নৃত্য রাজার
নৃত্যবাজ্য গড়িয়া উঠে, নৃত্য হাওয়া বইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে
আবার সামা, মৈত্রী, স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উড়ে উঠে।

এইরূপে বিশ্বজ্বলন মধ্য দিয়াই সৃষ্টিজ্বলন, অমঙ্গলের মধ্য
দিয়াই মঙ্গলের, দুদিনেব মধ্য দিয়াই সুদিনের অভ্যুদয় হ'য়ে
থাকে। কত বার প্রভু কত ভাবে কত রূপে এই রূপে প্রকাশ
হ'লেন। যখন যখনই অসুরগণের অত্যাচারে ধরার মাতৃ-জাতি
বিপ্লব হতে গিয়েছিল, তখন তখনই সেই অনন্ত মহাশক্তি—
অসুর নাশিনী কালীক রূপে, দুর্গতি হারিনী দুর্গারূপে, চামুণ্ডা
রূপে, জগদ্ধাত্রী রূপে জগদ্ধাত্রী নারী শব্দে আবির্ভূত হয়ে
ছিলেন।

যখন বৈদিক সনাতন ধর্ম ভারত হতে লুপ্ত হতে যাচ্ছিল,
ভারতে প্রকৃত ভাগ্য, ভোগ্য, কর্ম্য, জ্ঞান, যোগ্য ও প্রেমিকের
আসন একেবারে শূন্য হয়ে উঠেছিল, তখন প্রভু বহু রূপ ও
আকৃতি নিয়ে প্রকাশপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ রূপে সুপ্রকাশ হ'য়ে ছিলেন।
এই রূপেই তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে স্বদেশোদ্ধার
প্রকাশ হ'য়ে থাকেন। দুঃখী তাপী, পাপী, দীন-দরিদ্র, আত্ম-
আতুর, নিরাশ্রয় নির্যাগত, দুর্বলের জঘন্য তিনি এমে থাকেন;
ধনী, মানী, অহঙ্কারী জঘন্য নহে। সর্ব যুগ হ'তে এবার ধর্মের
তমাক্করু এবং প্রভুর করুণার এবার সমবিক বিকাশ। এবার
পাপী তপী, ধনী মানী, মুখ্য আত্মকেউ বাদ যাবে না, সকলেই

তাহা অহৈতুকী করুণা পা'বে । এবার যে তাঁর ঘাণ অব্যাহত
 'আস্ত্রে' শুনেছত 'কলি শেষে সত্য যুগ আসবে' ! এই-ই সেই
 সত্য-সাম্য-জাগরণ যুগের আগমন ! অহো কি আনন্দ ! সবে
 আনন্দ কর' ! আনন্দ কর !!

অবতার শরীরে তিনি বিশেষ ভাবে প্রকাশ থাকলে ও
 সর্বদা সর্বদেহে সর্বভূতে সর্বত্র ওতঃ প্রোত
 উহা স্বরূপ ।

ভাবে নিত্য কাল বয়েছেন । এ স্থূল দেহটা
 স্থূলদেহী জীবের স্বায় রূপ প্রত্যক্ষ করবার যন্ত্র স্বরূপ । এতে
 সমস্ত শক্তির ঘনীভূত ভাবেব বিকাশ ; তাই যে একবার দেখবে,
 পূর্ব স্বভাব স্ববণ হওয়ায় সেই-ই মুগ্ধ হ'য়ে যাবে, চ'লে আসতে
 চাবে, মিশতে চাবে । যে কোন শক্তি এর নিকট আসবে—
 টেনে নেবে, তাকে স্বরূপ চিনিয়ে দেবে । এ যে জীবন্ত চুম্বক
 এর এমনি প্রভাব ।

যে—“আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন,
 আপনে আপনা চাহে কর্ণে লালিঙ্গন ।”

এ নিজেকে নিজে আলিঙ্গন কর্তে চায় ! নিজের মধ্যে সবার
 মিশে যেতে চায় ! এ এমনই পরশমণি যে, শুধু লোহাকে
 'সোণা বনায় না, যা যা নিকটে পাবে, তাঁকেই নিজের স্বরূপ
 'পরশ ক'রে ছাড়বে । যাকে ছোঁবে, যে ছোঁবে সেই-ই ধূত
 হ'য়ে যাবে । তার হৃদয়গ্রন্থী ছিন্ন হ'য়ে যাবে, সে সমাধিঘরে
 গিয়ে স্ব-ভাবময় হ'য়ে যাবে ।

আর দেখবে—জগতের সমস্ত শক্তিই তাঁর নিকট অবনত

স্বস্তক । ক্ষিত্যপ্তভজঃমরুৎব্যোম্, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে, ধেনু
খেলায় সামগ্রী । কি জনশক্তি, কি রাজশক্তি, কি পশুশক্তি,
দৈবসুরশক্তি, সর্বশক্তিই তাঁর পদানত । দেশ কাল, পাত্র ও
পৃথিবীর অভাবানুযায়ী জ্ঞান ভক্তি কর্মশক্তি নিয়েই প্রকাশ
হয়ে থাকেন । লোকগুরু শঙ্করাচার্য্য জ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন,
তখন জ্ঞানের যত অভাব ছিল তত আর কিছুই ছিল না ।
যখন শুকমতামতে সংকীর্ণতায় ধরণী মরুভূমির মতন হ'তে যাচ্ছিল
তখন শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেব রূপে এসে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার
ভাব দিয়ে প্রেমব্যাঘ্র আত্মসমুদ্ভূত পর্য্যন্ত সারা জগৎ প্রাবিত
ক'রে দিয়েছিলেন । আর যখন সর্বটাই অভাব হয় তখন
তিনি সর্বশক্তি নিয়েই এসে থাকেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাই
পূর্ণ প্রকাশ অবতার ।

অবতারগণের শরীরে শক্তি অনুযায়ী কতকগুলি অভিনব
চিহ্ন থাকে । শরীরের গঠন মানুষের মতন দেখালেও চোখ,
কান, নাক, মুখ, হস্ত, পাদাদি একটু আলাহিদা রকমের, দেব ভাবের,
ধ্বজ-ব্রজাঙ্কুশ প্রভৃতি বহু প্রকারের সাময়িক নূতন চিহ্ন প্রকাশ
দেখে থাকে । কেনা লোকেই সহজে চিনে ফেলে ।

অবতার শক্তি কোটি কোটি জীবকে দর্শনে স্পর্শনে মুগ্ধ
ক'রে থাকেন । এবং লক্ষ্যে অলক্ষ্যে সমস্ত
পৃথিবীতে যে নব-ভাব ধারা প্রেরণ করিয়া
থাকেন, তার স্থায়িত্ব বহু শতাব্দী কাল
পর্য্যন্ত । অবতার পুরুষ একদেহে বা
একাকী প্রকাশ হন না । তিনি স্বাভা-

অবতার, অবতার—
পাশদ, ভক্ত, দিক—
পুরুষ, ও লাক্ষ
সব্বন্ধের ভিন্ন ভিন্ন
ভাব ।

পাশ্চ-ভক্ত-সিদ্ধপুরুষ প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে আসেন । এই অবতার-ব্যবহার মধ্যে যাহারা যে ভাবে এসে প'ড়বে তাহারাই চৈতন্য হ'য়ে যাবে ।

নিজের অভাব থাকিলে অন্যের অভাব দূর করা যায়না । অবতার পুরুষদের ত অভাবই নাই ; তাদের ভক্ত-পরিষদের ও কোন অভাব থাকে না, তারা শুদ্ধ-স্বচ্ছ-নিকাম-নির্মলা-নিত্যমুক্ত । তাই জীবের কল্যাণের নিমিত্ত ক'রে বেড়াতে পারে । এরা যে তাঁরই প্রতিমূর্তি । এ বিশ্বের সর্ব রূপই যে তাঁর । কিন্তু তফাৎ এই—যণীভূত ঐ প্রকাশ লীলার সহায় স্বরূপ প্রতিমূর্তি এরা । এদের সংসর্গে ও সদ্য-মুক্তি ।

ভক্তেরা তাঁকে সমস্ত সমর্পণ ক'রে তাঁর হাতের যন্ত্রবৎ চালিত হয় । তাদের ভাব—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, যেমন রাজা ও তেমনি বাজি, যেমন নাচাও তেমনি নাচি । এরা জীবমুক্ত-বস্থায় বিহার করে । তাঁরই কার্য্য শ্রী জীবনে প্রতিফলিত ক'রে জীবকে শিক্ষা দিয়ে যায় । এদের নিয়েই তাঁর বিশেষ প্রেমের খেলা । ভাগ্যগড়াই তাঁর লীলা, তাই এ লীলা-রহস্যের মধ্যে এরাই সম্যক কার্য্যকরী, তাঁর হেলুড়ে ।

যারা সিদ্ধ পুরুষ, সাধনা দ্বারা সিদ্ধ, তারা তাঁর সম্যক প্রকাশের সময় ও এসে থাকে, আবার অন্য সময় ও এসে থাকে । অবতার শক্তির কড় নিকটে কড়ুবা দূরে থেকে, তাঁরই প্রবৃত্তি পথে কঠোর জীবন সাধন ক'রে—সাধনা ক'রে সেই ধর্ম্মকেই সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করে । এরা ও লোক-কল্যাণের

নিমিত্ত সমস্ত শক্তি ব্যয় ক'রে পরিশেষে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হয় ।

আর এক, শ্রেণীর সঙ্গী আসে, তারা সাধক । তাঁরীও তাঁর প্রকাশ বা অপ্রকাশ সময় নিকটে বা দূরে- পথেক 'তাঁরই প্রবর্তিত পথে সদগুরুর উপদেশ নিয়ে তাঁরই আরাধনা করে । গুরুতে তাঁরই বিশ্বাস বেথে—গুরুতে ভগবানে অভেদ জেনে গুরু ॥ সহিত এক হ'য়ে তাঁতেই লীন হ'য়ে যায় । জগতের সকলকেই এইরূপে এই প্রক্রিয়ায় নির্বাণ মুক্তি লাভ ক'ন্তে হবে ।

এবা তাঁর কার্যের সহায়ক হ'য়েই আসে, আর অল্প বিস্তর কপে তাঁর কার্যই ক'রে চ'লে যায় । কিন্তু সে ভিন্ন কেউ সেই নিকার্ম অহৈতুকী প্রেমভাব-ব্রজরস দিতে পারে না ।

“যুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে,

কিন্তু, আমা ভিন্ন অন্যে নারে ব্রজরস দিতে ।”

অবতার সঙ্গীরা সমস্তই পারে, কিন্তু পারে না কেবল ব্রজরস দিতে; সেই নিম্নলিখিত অহৈতুকী মহাভাব দিতে ; কারণ এ সব যে তারা তাঁর নিকট হ'তেই পেয়ে থাকে, এ যে রাধারাণীর খাস ভাণ্ডারের ধন, ঈর্ষচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন যে এ ভাণ্ডারের আর অন্য মালিক নাই । তার এক এক কণা পেয়ে ব্রজা বিমুগ্ধ শিব বিভোলা হ'য়ে যান ; অন্য পুরে কি কথা ।

যখন পৃথিবীতে অবতারের আধিভাব হয়, তখন রাজা, প্রজা, ধনী-দারিদ্র, পণ্ডিত-বুর্জ সব একাকার হ'য়ে যায় । তাঁর মহাভাব ভরসে খাল, নালা, জোবা, নদ, নদী সব পূর্ণ হ'য়ে যায় ;

কূল ছাপিয়ে টেউ উঠে সব চর, চাচড়, ওচখোচ ভেঙ্গে চুরে সমান
ক'রে দেয়।' ষাপরে এইরূপ একবার মহাপরিবর্তন 'হয়ে
গিছলো, এবার আবার সেইরূপ গুলটপালট মহাপরিবর্তনের
যুগ আরম্ভ হ'য়েছে ।

অবতারেই অবতারের সম্যক প্রচার ক'রে থাকেন। যার
যে ভাব তা সেই-ই। ম্যক প্রকাশ কর্তে পাবে। ও গো,
বিশ্বাস করো। প্রতি অবতারেই পূর্ব পূর্ব অবতারের ভাব,
ভক্ত ভাবে সময়োপযোগী ক'রে প্রচার ক'রে তা সুপ্রতিষ্ঠিত ও
মহিমাম্বিত করেন। এক এক অবতারের অন্তর্ধানের পর
পুনঃ অবতারে তাঁর কার্যের সমর্থনেই উহার পূর্ণ বিকাশ হ'য়ে
যায়। তোমরা কে কি কর্তে পারো? কি করো? যাঁর—
তিনিই করেন !

আর কি? এই ত দেখলে, শুনলে, প্রেমের খেলা দেখলে,,
এখন কাজে লেগে যাও। দীন-দরিদ্র; এরাই তোমাদের বন্ধু
মুখার্ভ-নির্গ্যাতিতেরাই তোমাদের বন্ধু, ঋণী-সহায়-দুঃখলহীন
তাদের জন্যই ত তোমরা এসেছ ! তাদের কাজেই লেগে যাও।
জীবে প্রেম কর। জেনো প্রেম-প্রেমই সবওয়া।

ধর্ম ।

ভগবানের নিকট পৌঁছাবার পথই ধর্ম । যে 'সকল উপায়' ধর্ম কাহাকে বলে ॥ ভাব অবলম্বন ক'রে জীব পুনঃ স্ব-ভাবে সেই ব্রহ্মভাবে লীন হ'য়ে যায়,— তার নামই ধর্ম !

ধর্ম. এক, আবার বহু প্রকারের । যেমন একই জলরাশি বর্ষ এক না বহু । সম্পন্ন পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা প্রভৃতি নদী বিভিন্ন রংয়ে বিভিন্ন দিক্ হ'তে ভিন্ন ভিন্ন আকারে একই সাগরের দিকে ছুটে চ'লছে, ভিন্ন ভিন্ন ব'লে দেখাচ্ছে, কিন্তু ছুটে ছুটে এসে শেষে সীমার যেখানে সাগর সঙ্গমে মিলেছে, সেখানে আর তখন কোন বিভিন্নতা নাই, সব এক । তদ্রূপ ভোমাদের সকলেরও উদ্দেশ্য যখন ঐ একই সাগরে যাওয়া, তখন সকলে এক রূপে একই পথে না গেলেই বা লোকসান কি ? আর যাবেই বা কেমন ক'রে ? সকলেই ত আর একরূপ, একই স্থানে নও । তাই যার যে নদী নিকটে, যার যে পথ জানা এবং সুলভ, সে সেই পথেই যাত্রা শুরু করুক । চলতে চলতে সেই অনন্ত ভাব সমুদ্রের মুখে যখন এসে প'ড়বে তখন দেখবে সকলেই একই ভাবে একই স্থানে এসে মিলছে, সকলেই শেষে গন্তব্য স্থান— ঐ একই মহাসাগরে এসে পড়ছে । তখন ভাব সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে তালে তালে চলতে ভারী আরাম । তাই যার যার মনমত পথে সাধনা ক'রে যাও, একদিন সেই ভগবান রূপ মহাসাগরে যখন এসে প'ড়বে—তখন দেখবে সকলেই এক পথ, নান্যাপন্থা ।

যে নীচু ভূমিতে রয়েছে, সেই জমির ও তাহার উঁচু নীচু মাইলের বিভাগ প্রভৃতি বিকৃতি দে'খে থাকে। কিন্তু যে উচ্চ ভূমিতে, পর্বত শিখরে, সে দেখে, সব সমান এক রূপ, কোন ও প্রভেদ নাই। দেখ'ছ না, এই আমি তোমাদের পাগলা ঠাকুর। তোমরা কেউ আমাকে শ্রীকৃষ্ণ ভাব'ছ, কেউ রামকৃষ্ণ ভাব'ছ, কেউ চৈতন্য ভাব'ছ, কেউ কালী, কেউ শিব, কেউ পিতা, কেউ মাতা, কেউ বন্ধু, প্রভু প্রভৃতি যার যার রুচি অনুসারে ভেবে ভেবে এগোচ্ছে। কিন্তু যখন একটু উচ্চভাবে—যখন কীর্তনে তোমাদের একটু ভাব হয়, তখন আর, বিভিন্ন রুচিটুটি থাকে না, দেখো সকলেই এক, এক অনন্ত-অব্যক্ত চৈতন্যময়, সত্ত্বা স্বরূপ। তখন আব আমি তুমি সে প্রভৃতি দ্বৈত জ্ঞান থাকে না, থাকে শুধু সর্বব্যাপী এক সত্য ভাব। পরে এমন হয় যে এক বোধ ও লোপ পেয়ে যায়, কি যেন কি যে ভাব হয় তা বলা যায় না। ভাষায় তাহা ব্রহ্ম ভাব রূপে আভাষে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হয় মাত্র। ততএব উদ্দেশ্য-মূলবস্তু যখন এক, সকলেরই মনঃগণ গন্তব্য এক স্থানে, কেউ আশু আব কেউ ধীরে যাচ্ছে, তখন যেতে দাও, যেতে থাকো। কারু ভাব নষ্ট ক'রো না। যে, যে ভাবে যায় থাকে। যাওয়া বন্ধ ক'রো না, বরং যার যার ভাবে থেকে, যার যার নৌকায় থেকে গল্পগুজব ক'রে ক'রে আরামে চলতে থাকো, পরস্পরকে চলার পথে সাহায্য কর ; হাই হার্ম্ব।

ধর্ম্মের কয়েকটি সাধারণ বা স্বাভাবিক সত্য আছে। য'বধি, কয়েকটি আবহমান কাল হ'তে—ধর্ম্মকে যে, সে নাম ধারণ সত্য। দিয়েই প্রচার ক'রক না কেন, এ স্বাভাবিক

স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞাগুলিই তাদের একমাত্র ভিত্তি । পার্থক্য কেবল, দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগে বাইরের রং ফলান মাত্র । আর এতেই না বোবা গোড়া লোকদের মধ্যে যত গোলার সৃষ্টি হ'য়েছে । জগতে যত প্রকার ধর্ম মতের সৃষ্টি হ'য়েছে, উহাদের প্রত্যেকটিবহু মূল মন্ত্র—সত্য বোধ্য রক্ষা করা, জ্ঞান ভক্তি-প্রেম লাভ করা, পবিত্রতা-মুক্ত ভাব পোষণ করা, নিয়ত নিষ্কাম কর্ম করা, তাঁতে—যা হতে এসেছে, তাঁতে পুনঃ মিলে তাঁই হ'য়ে যাওয়া । এই প্রেম-ভাব-সমাধি—ভগবানে পুনঃ ফিরে যাওয়াই সকল ধর্মের সকল প্রাণীবই এক মাত্র উদ্দেশ্য । এর পর আর নেই । এই সত্যই বাব বাব পুণ্য নতন, নতন-পুণ্য আকারে ঘুরে ফিরে আসছে । ভাঙ্গাগড়াই বহস্য, সেই চক্রধারার গূঢ়চক্রান্ত

“আমি করি খেলা-শক্তিরূপা মম মায়া সনে,

একা আমি হই বহু, দেখিতে আপন রূপ !

” ভবিবল্ হরিবল্ ওম্ !

ও. গে, দেখিছ না, ঐ মুক্ত সুনীল স্বচ্ছ আকাশে কেমন' খোল্লা হাওয়ায় পাখা খুলে ভেসে বেড়াচ্ছে! আঃ! কী আরাম! খেঁদিনি' ঐরূপ খোলা হাওয়ায় স্বাধীন ভাবে স্বাধীন আনন্দে নর-নারীরা সকলে ভেসে বেড়াতে শিখবে, জানবে, কেবল সেইদিন—সেইদিনই ধর্ম রাজ্যে নেবেছ জানবে .

ধর্ম প্রচার ।

তার কথাই ধর্ম কথা । তার কথা, তাঁর কাজ, তাঁর ভাব বিস্তার ই ধর্ম প্রচার । সেই নিজস্ব অনন্ত সন্তাব জাগরণ, করাই 'সকলজীবের উদ্দেশ্য', 'আবার ঐ বিষয়' অন্যকে সাহায্য

করাতেই নিজের চৈতন্য জাগরিত হ'য়ে থাকে। প্রচারের ইহাই উদ্দেশ্য। ১০ পরের উপকারেই নিজের উপকার হয়। পর কে? তোমারই ত সব বিভিন্ন রূপ। পর শ্রেষ্ঠ পর ব্রহ্ম।

একদিন বাড়ীতে আসতে দেখে জয়দেবী (শ্রী শ্রীঠাকুরের কন্যা) 'বাবা, বাবা' ব'লে এসে জড়িয়ে ধরেছে। তার সঙ্গে একটি বালক খেলা কচ্ছিল, সে ও এসেছে। জয়দেবী নিজে যেমন 'বাবা, বাবা' ব'লে আনন্দ প্রকাশ ক'চ্ছে, তেমন তার সঙ্গী বালকটীকে ও বলছে "তুই ও বল, বাবা এসেছে, বাবা এসেছে।" তার ভাব দেখে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম! তার বাবা নয় সে ব'লবে কেন? "বাবা, বাবা" ব'লে যে আনন্দ জয়দেবী পাচ্ছে, তা সামলে রাখতে পাচ্ছেনা; সে আনন্দের অংশ সঙ্গীকে না দিতে পারলে যেন তার আনন্দ পূর্ণ হয়না! সে একা পাবে কেন? সকলে পা'ক, সকলে পেলেই তার সকল পাওয়া হবে, সেইরূপ এই ব্রহ্মানন্দ-ধর্ম জীব, সাধক নিজে পেয়ে অন্যকে ও না পাওয়ায় পারলে তার পাওয়া—আনন্দ পূর্ণ হয়না, সাধ মিটেনা এ ভাব সবাই পা'ক গো, সবাই পা'ক!

বৃন্দাবনে ব্রজগোপীদের ছিল নিকাম প্রেম ভাব। তারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পতিজ্ঞানে—প্রভু জ্ঞানে যথাসর্বদ্বন্দ্ব দিয়ে ভজনা করে সমুদ্র হোত। তারা প্রভুকে পেলে ভাবত অনো ও প্রভুকে পা'ক, গোয়ে আমাদের আনন্দ বৃদ্ধি হো'ক। প্রভু এলে যদি কোন জন দূরে থাকতো, তা হ'লে, তাঁকে ও ডেকে নিয়ে আসতো। তাই পূর্ণানন্দাৎসব রাসলীলার ৬ দিনে সমস্ত গোপী সহ

শ্রীকৃষ্ণের মিলন না হ'লে রাস হোত না । সাধুরা ও তজ্জপ ধর্ম রস নিজে পেয়ে অন্যকে না দিতে পারলে সোয়াস্তি পায় না—সাধু পূর্ণ হয় না, তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তারা প্রচারে বেরুতে বাধ্য হয় । প্রচার ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে,—অন্যজনকে প্রকাশ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তেই তাঁর স্বপ্রকাশ পূর্ণরূপে বিস্তার হয়ে যায় ।

কিন্তু জেনো, ধর্ম কখনো শুধু মুখে প্রচার করার বস্তু নয় কাজে প্রচার ক'র্ত্তে হয় । আমার **রুদ্রানন্দ**ই ছিল যথার্থ প্রচারক । কোন দিন মুখে একটা কথা ও বলে না, অথচ তার ভাব দেখে কাজ দেখে কত লোক শিক্ষা পেয়ে গেল, ত'রে গেল । **অমূল্য** বুদ্ধ বস্তু পেয়ে ধন্য হয়ে গেল !

প্রচার সোজা কথা ! যে সম্পূর্ণ আত্ম-ত্যাগী হ'য়েছে, অহমিকা ভাব একেবারে শূন্য হ'য়েছে, সেইই প্রচারের উপযুক্ত হ'য়েছে জানবে । যে চায় না সেইই দিতে পারে । চাওয়া থাকতে দেওয়া যায় না । তবে দেওয়ার অভ্যাস ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে আবার অনেক জায়গায় চাওয়া ও বন্ধ হ'য়ে যায় । যে যথার্থ ত্যাগী, প্রকৃত ভাবুক, তার কোন সমস্যাই ভাবের অভাব হয় না । সে যা ক'র্বে, যা বলবে রাজা-প্রজা-পণ্ডিত-মূর্খ শুনবে, একবাক্যে নত শিরে স্বীকার করবে, মানবে । কিন্তু যার মূলে কিছু নাই, কুলে খপ্ খপি, তার কথা কেই বা মানে, আর কেই বা শুনে !

“ ধর্ম-বড় গুহ্য বস্তুরে ! ধর্মস্য তৎসং নিহিতং গুহ্যাং । সদগুরু নিকটই মাত্র উহার গুহ্য বিষয় গোপনে পেতে হয় । গুরু যারে তাঁরে উহা দেন না । দেওয়াও ঠিক নয় । কারণ যে, যে জিনিষের

কদর না বোঝে, যে, যে বস্তুর মৰ্ম্ম না জানে, তারে সে জিনিষ
দিধে উহার অপব্যবহারই হয়ে থাকে । ওতে নিজের ক্ষতি,
অন্যেরও ক্ষতি হয় । যৈছা ক্ষেত্র তৈছা বীজ চাই । যে যেক্রপ
ভাবের, তারে সেই রূপ ভাবের উপদেশ দিবে । কিন্তু সাবধান,
যেন ভিতরে অহংভাব না আসে, নিজে নিজে জগদ্‌কর্তা হয়ে না
বসে । তাহলে ক্ষেত্রের তা ও যাবে, হাতের পাঁচ ও যাবে । তাঁর
কায়, তাঁরই এযন্ত, তিনিই এর ভিতর দিয়ে ক'রে যাচ্ছেন, ভাল
হ'লে ও তিনি, মন্দ হ'লে ও তিনি, তিনিই সব কচ্ছেন । তাঁরই
সব লীলা !

কৰ্ম্মযোগ বা কৰ্ম্ম রহস্য ।

কৰ্ম্ম কি ।

“কৰ্ম্মণ্যোবাধিকারস্তে মা ফলেনু কদাচন ।”

কৰ্ম্মেই তোমার অধিকার ফলে কভু নয় । আসক্তি শূন্য হ'য়ে
পরোপকারের জন্ত যা কিছু চেষ্টা কর, তাহাই কৰ্ম্ম । বাকী সব
অকৰ্ম্ম । মনে কাম রেখে কিছু কন্তে গেলেই বন্ধনে পড়তে হয় ;
বা বন্ধন হ'তে মুক্তি এনে দেয়, তাহাই কৰ্ম্ম । জ্ঞানীরা যেখানে
জ্ঞানের দ্বারা, ভক্তেরা যেখানে ভক্তিবারা, ষোগীরা যেখানে
যোগ দ্বারা উপস্থিত হয়, একমাত্র নিকাম কৰ্ম্মদ্বারা কৰ্ম্মারাও
সেইখানে উপস্থিত হ'য়ে থাকে । কৰ্ম্মই চেষ্টা, কৰ্ম্মই সজীবতা,
নিকৰ্ম্মতাই মৃত্যু ।

যার সামনে যে কাজ প'ড়বে, যে আজীবন যে কাজ ক'রে
কৰ্ম্মে সবাই সমান । আসুছে, তা সুন্দররূপে সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন
করাই তার কর্তব্য । যে রাজ কৰ্ম্মে বতী হ'য়েছে, তার রাজ

অশ্রুদানবন্ধু বান্দা মাছাফা

কর্ম, প্রজা পালনই কর্তব্য। যে মেরু, তার ময়সা পরিষ্কার করে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা করাই কর্তব্য কর্ম। একপ কৃষকের কৃষিকর্ম, ব্যবসায়ীর ব্যবসায় কর্ম সম্পন্ন দ্বারা জন সাধারণের—গণ-নারায়ণের সেবা করাই কর্তব্যকর্ম। সংসারীর সংসারীর কর্তব্য, সম্মানীর সম্মানসীব কর্তব্য কর্ম, যার বে কর্তব্যই হোক না কেন কর্তব্য ফুরালেই—কর্ম শেষ হলোই মুক্তি-মোক্ষলাভ।

শ্রোমরা পড়েছত, একবার শেরশাহের আক্রমণে মোগল বাদশা হুমায়ুন গঙ্গা কাঁপিয়ে পালাবার সময় যখন ক্লান্ত হয়ে ডুবে যায় যায় এমন অবস্থা হয়েছিল, তখন তা দেখে এক জেলে দয়াপববণ হ'য়ে, তাকে ডিঙ্গায় তুলে পর পারে নিয়ে দিলে, বাদশা শ্রাণ পেয়ে তাকে বল্লে—“আমি মোগল বাদশা, তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ, সেজন্য তুমি আজ আমার নিকট বা চা'বে, তাই তোমাকে দিয়ে দিব। তুমি আমার নিকট এখন কিছু চাও ? সে জেলে এক ছুন্টের পরামর্শ শুনে চাইলে, “যদি তাইই হয়, তবে তোমার সিংহাসনে ব'সে আমি তিন দিন রাজা হ'য়ে রাজত্ব কর্কে, এই আমায় ক'রে দাও।” তাই হ'বে ব'লে বাদশা তাকে নিয়ে রাজধানীতে চ'লে এলেন এবং তাকে “রান্সিসহস বসিয়ে দিলেন। ছত্রধর ছত্র ধ'রলে, পাত্র মিত্র অমাত্যেরা চা'রদিকে ঘিরে বস্লে, নর্তকীরা নৃত্য করতে লাগ্লে দামদাসীরা করজোড়ে আজ্ঞার আশায় র'লো। আর সঙ্গে সঙ্গে এ নালিশ সে নালিশ এসে পড়তে লাগ্লে—অমুক আমার গাভী ক'য়েছে, অমুক অমুককে প্রহার ক'য়েছে, অমুক কন

দেয়না, অমুক রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি
 দেখে শুনে তার হৃদকম্প উপস্থিত; সে ভেবেছিল রাজার মত
 বুঝি কেউ দুখী নাই। মাছ ধরা বেচা হতে রাজস্ব করা বুঝি
 ভারি সুখের বিষয়। কেবল কতকগুলো রাণী নিয়ে আমোদ
 প্রমোদ করা, ভাল ভাল খাবাব খাওয়া, আর দিনরাত নানা গল্প
 গুজবে শুয়ে ব'সে কাটান! কিন্তু এ কি উৎপাত। এত
 বিচারবিচার, টানাখেচা হেঙ্গাম কেন হে? এর থেকে ত
 আমার সেই মাছ ধরা বেচাই শত গুণে ভাল। কোনও জঞ্জাল
 নাই, ধরলাম, বেচলাম, খেলাম, সুখে নিদ্রা গেলাম। এ কি?
 এ খেতে সময় নাই, শুতে সময় নাই, এত কি এক জনে পারে?
 এ আমি পার্কি না এ আমার সাজে না। এক দিনেই তার
 বাজতের সখ মিটে গেল। রাজার পায়ে পড়ে এসে বলে
 মহারাজ আমার অস্থায় হয়েছে, ক্ষমা কর, তোমার কাজ তুমি
 কর, আমাকে বিদায় দাও। আমার কাজই আমার তান,
 তোমার কাজও তোমারই ভাল। ব'লে প্রণাম করে দৌড়িয়ে
 এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

রাজারও তরুণ নৌকাচালা, মাছধরা প্রভৃতি মহাবিপজ্জনক।
 বস্তুতঃ যার যা কাজ, যার যা সাজে, তার তা-ই কায়-মন্নরাকো
 উত্তমরূপে পূর্ণরূপে সম্পন্ন করাই তার কর্তব্য। মহারাজ,
 কবিরাজ, কৰ্ম্মকার, চৰ্ম্মকার, ঝাড়ুদার, সরদার, সবই চাই,
 সকলেরই সকলের প্রয়োজন। হেঁউ না হলে কেউ বাঁচতে
 পারে না। ভ্রাক্ষণ-কত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র সকলই পৃথিবীতে দরকার।

যে দেশে যখন এর একটির ও অভাব হয়, তখন সে দেশে নানা বিশৃঙ্খলা এসে শীঘ্রই ধ্বংসের দিকে চলে যায়। জগতের কীট পরমাণু পর্য্যন্ত সকলেই সকলের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। এ ওকে সাহায্য করে, সে আবার অন্যকে সাহায্য করে, এ ওকে খেয়ে, সে আবার তাকে খেয়েই বেঁচে থাকে। সারা দুনিয়াই এইরূপে পরস্পরের সাহায্যে চলছে। যেদিন এই সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে, জাতি বন্ধ হয়ে যাবে, সেই দিনই সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই জেনো—কোন কর্মই ছোট বা বড় নয়। কর্তব্য সম্পন্নতা নিয়েই বড় ছোটব কথা। যে যা ধরে আছে, সম্পূর্ণরূপে তা করে যাও, করে শেষ কর, মুক্ত হও। ইহাই কস্মের রহস্য।

বর্তমান মানব সমাজের কর্ম আবার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক গৃহকর্ম, আর সন্ন্যাস কর্ম। সন্ন্যাসীর কর্তব্য—মায়া ক্ষমতা, রূপা লজ্জা ভয়, ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সমস্ত একেবারে ত্যাগ করে তিতিক্ষ হ'য়ে অটুট সংযম হ'য়ে বিরাগ-বিরেকী হ'য়ে সমস্ত শক্তি, সমস্ত জীবন পরের জন্য চিরউৎসর্গ করা, যত সর্ব লোকের সর্বজীবের ইহ-পরকালের উন্নতি হয় তার চেষ্টা করা। পরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে—বলি দিয়ে দেশ পরিভ্রমণ করা। একমাত্র ত্যাগ ও সেবা ত্রুত নিয়েই সে মুক্তির পথে থাকবে। বড় কঠিন কর্ম, বড় কঠিন কর্তব্য।

কিন্তু গৃহস্থের কর্তব্য আরো কঠিন। নিজে কুর্ভাগ্যে ও

ঐক্যতা হয়ে সেবক হয়ে পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভ্রাতাভগ্নী, স্বামী
স্ত্রী, আত্মীয়বান্ধব, অতিথি প্রভৃতির ভবনপোষণ ও মনস্তৃষ্টি সাধন
কর্ত্তে হবে। পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে। দেশ
দশের উন্নতি বিধানে যথাসাধ্য যত্ন কর্ত্তে হবে। আবার
নিজেকে অনাসক্ত নিলিপ্ত রাখতে হবে। তবে জেনো—

“স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ।”

যে যেটা ধরে আছে, ধরে থাকো। এটা ফেলে ওটা, ওটা
ফেলে সেটা করে বেড়ায়ে না। সন্ন্যাস নিয়ে থাকোত সন্ন্যাসীর
কর্ত্তব্য করে যাও, আর গৃহী সেজে থাকোত গৃহস্থের কর্ত্তব্য
করে যাও। মেয়ের কাজ মেয়ে, পুরুষের কাজ পুরুষে করো।
জীবনের সময় বড় অল্প, নাড়াচাড়া করে এ তমূল্য জীবন নষ্ট
করো না।

কর্ম্মে শক্তি নেমে যে কর্ম্ম করে তাব নিকট শক্তি অপনিই
আসে।

নেমে আসে। তাকে চেয়ে নিতে হয় না।

যেখানে যার ব্যবহার হয়, সেইখানেই তা গিয়ে জড় হয়ে থাকে।
কঁুড়ে অলসের নিকট কি কিছু যায়? শক্তির ব্যবহার যে করে,
তাকেই সে আদরে। শাক্তের নিকটই থাকে শক্তি। ভূমি
এই দেশের যত ক্ষুধিতের মুখে অন্ন, মূর্খের মস্তিষ্কে জ্ঞান আর
আর্ত্তের ত্রাণের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে কেঁপে পড়ো দেখি, শক্তি
তোমা ছাড়া হয়ে কোথা থাকে? দেশের সমস্ত ঐর্ষ্যা বীর্ষ্য,
জনশক্তি, জ্ঞানশক্তি সব এসে ছানির হয়ে, জ্ঞান-ভক্তি-মোক্ষ
পর্যন্ত এসে বাঁবে। আসল কথা হচ্ছে—কাজ। কাজ কর

আমাকে ক্ষণমুহূর্ত ও কাজ ছাড়া দেখ কি ? কাজ না করলে ও কি ? আমি কোন অভাবে পড়ি ? কিন্তু তা হয় না, আমি ত্রা পারি না । কাজেই আমার আনন্দ । কাজ কত্তেই এসেছি, কাজ কবেই যাবো । যখন রাত্রে দু' এক ঘণ্টা সময় পাই, তখন তোমরা ভাব—কেউ কেউ যে আমি ঘুমুছি ? কিন্তু ঘুম হয় না, ঘুম আসে না । ঐ সময় একটু অবসব পেয়ে কে কোথায় কি কচ্ছে না কচ্ছে, কে কোন বিপদে পোল, কে কি কর্তো, এ সব দেখি, চিন্তা করি । স্থল শরীবটা এখানে থাকলে ও সূক্ষ্ম শরীরে গিয়ে তাদের চৈতন্য করে দি, তাদের হয়ে কবে আসি । কস্ম কস্ম-হে ! কস্ম ই সবার মূল ।

এই কস্ম যখন জীবের শেষ হয়ে যাবে, তখনই মুক্তি—জীবমুক্তি । তখন বিশ্বাত্মায় অভেদ হয়ে আত্ম-তৃপ্তিতে বিভোর হয়ে যাবে । কোন কস্ম ই আর থাকবে না । কস্ম সমাধা হলেই সমাপ্তি, মহানির্ব্বাণ ।

কস্মে অন্যাক্তই আসক্তিগুণ্য কস্ম কেমন জানো ? যেমন আত্মত্যাগি, আত্মত্যাগই মুক্তি । কারু কারু মুদ্রাদোষ থাকে । একদিকে মন রয়েছে, অথচ হাত দিয়ে নথ্ খুড়লে কি পাতা ছিঁড়লে, পা নাচালে ইত্যাদি । আবার কৃষকদের দেখবে—তারা হাতে কাজ কচ্ছে, আবার গল্প কি গান কচ্ছে মুখে । তখন তাদের মন থাকে ঐ গানে বা গল্পে, কিন্তু কর্মশ্রিয় দ্বারা কাজ হয়ে যাচ্ছে । কোন ও ব্যাঘাত হচ্ছেনা । এমতাবস্থায় তারা কস্মে আসক্তি ধরে রেখে করে যাচ্ছে । তবে তাদের মনে ঐ গল্পে কি

গানের, সু-কু-ভাবে মध्ये সু-কু ভাবে বিভোর হ'য়ে আছে। আর যখন ঐ মন কি আত্মা কীৰ্ত্তনে বিভোর হ'য়ে একেবারে তন্ময় হয়, তখন সু-কু-র পারে চ'লে যায়, তুমি আমি তার বোধ থাকে না, অনন্ত-অবয় আত্মায় আত্মস্থ হ'য়ে যায়। তখনই তাকে বলে আত্ম-ত্যাগ, আর উহাকেই মুক্তি বা মোক্ষ বলে।

এইরূপে সমস্ত কস্ম যে অনাসক্ত ভাবে, ভাসা ভাসা রূপে ক'রে যায়, তারই জীবমুক্তি বা পরামুক্তি লাভ হয়। যে একবার গা ভাসান দিতে শিখেছ, সে আর বন্ধ আসক্তির দিকে যেওনা। ক্রমশঃ ভাসা ভাসা, আল'গা আল'গা হ'য়ে যাও ! সাক্ষীবহ হ'রে যাও !

অন্তরে কামনা রেখে যা কিছু করবে তার ফলভোগ কতই হবে। তা এঞ্জন্মেই হোক, পরজন্মেই হোক।
কর্ম বল।
বা দু'দিন আগু পিছুই হোক, ভোগ আসবেই। অন্তরপটে কামরেখার দাগ প'ড়ে যায় কিনা। যদি কৌশলে ঐ রেখার দাগ পড়াতে না পারে, তবেই বেঁচে যাওয়া যায়। এই দাগ এড়াবার কৌশলে স্নকৌশলী

শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন—“যৎ করোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ,
যতপস্যসি কোদন্ত্য ! তৎ কুরুষ্মদপূর্ণম্।”

হে কোদন্ত্য, যা আহাৰ কর, পূজা কর, দান কর, তপস্যা দি
যা-যাই কর, সমস্তই আমাতে সমর্পণ ক'রে কর, তোমাকে প্রভুতে

সমর্পণ ক'রে কর, সেই অনন্ত সত্যার হ'য়ে ক'রে যাও, গায়ে কোন দাগ লাগবে না।

হাতে তেলমেখে কাঁঠালের ভিতর হইতে কোষ বে'র ক'রে, নিলে যেমন হাতে ওর কোন দাগ লাগে না, ওদ্রুপ এই বিশাল জটিল রহস্যময়-কটেকপরিপূর্ণ কর্ম জগৎ হ'তে মুক্তিকোষ বে'র ক'রে বিনতে হ'লে, আগে অকামনাকপ—তাঁতে সমর্পণকপ—তেল মনে মালিশ ক'রে নেও, তবে ওর আঠায় বদ্ধ ক'রে ফেলতে পারবে না।

ওগো চিন্তা কিসের? প্রভুর হ'য়ে কার্য্য ক'রে যাও। ফলাফল, লাভালাভ সেই মাহাজনের। তাঁর রাজ্যে আমি তাঁর হ'য়ে স্বাধীন ভাবে বিচরণ কতে পাচ্ছি, এব চেয়ে আর কি চাই? হিসাব-নিকাশে আমার কোন দবকার নাই, খাটতে এসেছি খেটে যাই। পান্থীর মত বাহু বিস্তার ক'রে অনন্ত-মুক্ত্যাকাশে ভেসে যাও। হুমি যে নিত্যমুক্ত, নিত্য-স্বভাব, নিত্যানন্দময়!

বীৰ্য্য ও সত্য রক্ষা।

যেখানে বীৰ্য্য সেখানেই সত্য, যেখানে সত্য সেখানেই প্রেম,

বীৰ্য্যের ওপর সত্য প্রেম স্বরূপই ভগবান।
প্রতিষ্ঠিত।

বীৰ্য্যই বল শক্তি। বীৰ্য্যই শরীরের কেন্দ্র স্বরূপ ধাতু।
এই বীৰ্য্য না থাকলে শরীর থাকে না। শরীরের সুস্থতা, সবলতা,
সমতা একমাত্র বীৰ্য্যের ওপরই নির্ভর করে। খাওয়া দ্রব্য সাতবাব
ছেকে ছেকে যেয়ে এই বীৰ্য্যাতে দাঁড়ায়। এর পরে মস্তিষ্ক,—
মস্তিষ্কের পরে মন, মনের পরে তবে আত্মা বিরাজ করেন।

এই স্থূল ইন্দ্রিয় সমন্বিত স্থূলদেহের পর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়
সমন্বিত মনোরূপ সূক্ষ্মদেহ প্রতিষ্ঠিত। তার ওপরে আত্মা।
জীবিতকাল পর্য্যন্ত দেহের সহিত মনের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে,
'দেহ দুর্বল ও অসুস্থ হ'লে মনও দুর্বল ও অসুস্থ হয়'। দেহ
সতেজ ও পবিত্র থাকলে মনও সতেজ ও পবিত্র থাকে। মনের
সম্বন্ধে ও তাই, মন সতেজ ও পবিত্র থাকলে দেহ ও সতেজ
ও পবিত্র থাকে। বস্তুতঃ মনের বিকারে শরীরের বিকার,
আবার শরীরের বিকারে মনের ও বিকার এসে পড়ে।

শরীরের মূলবস্তু বীৰ্য্য। যার এই বীৰ্য্য অটুট থাকে, তার
শরীর ও অটুট—স্বাস্থ্যসম্পন্ন থাকে। শরীর ঠিক থাকলে মনও

ঠিক থাকে। মন ঠিক থাকলে বাক্যও ঠিক রাখতে পারে।
এই বীর্যের ওপরই যে সত্যের প্রতিষ্ঠা; তাই সত্যরক্ষা কর্তে
হলে আগে বীর্ষ্যরক্ষা কর্তে হবে, ব্রহ্মচারী হতে হবে, ব্রহ্মচর্য
পালন কর্তে হবে। দেখা যায়—যে সবল, ক্ষমতাবান, যার কিছু
কর্মবার শক্তি আছে, সেইই মাত্র সত্য ঠিক রাখতে পারে। যে
দুর্বল, সে চঞ্চল। চঞ্চল ব্যক্তির মন ও চঞ্চল, সে কোন বিষয়
বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না, তা সত্য-ধর্ম মুখের বাক্য ঠিক
রাখবে কেমন কবে? দেখছ না, যারা সর্দার, বীর জিতেন্দ্রিয়,
যোদ্ধা, তারাই সত্যবাদী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ধার্মিক হয়ে থাকে।
সেই সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে পেতে হলে আগে ক্ষত্রিয় হতে হবে,
বীর-মহাবীর হতে হবে। তবে ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় না হয়ে ব্রাহ্মণ
হওয়া যায় না। দ্বাপর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ভীম। তাই সে
আশ্রিত দণ্ডকে রক্ষা করার সত্য দিয়ে, সেই সত্য রক্ষার জন্য
স্বয়ং প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেও ধর্ম যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছিল।
দুর্বলের কি কাজ হে? চাই বলবান্, বার্যাবান্, মহাশক্তির
বিকাশ।

• এই এখনো তোমরা ঈশদেব পূজা কচ্ছ, ধ্যান কচ্ছ, সেই
পূর্ব পূর্ব দেবদেবাদের প্রতিমূর্তির দিকে চেয়ে দেখো দেখি! কয়
জনে তাদের অনুকরণ কচ্ছ? প্রকৃত পূজা কচ্ছ! তাদের
প্রতিমূর্তিগুলি যে অনন্ত কালের, অনন্ত শৌর্যবীর্যের আধার,
অনন্ত প্রতিভার, অনন্ত শক্তির বিকাশ। ন্যাভ্যুতোর কাজ নয়
পে! যাদের জীবন নিয়েই বেঁচে থাকবার শক্তি নাই, তারা

আবার সেই অনন্ত শক্তিময়কে পাবে কেমন করে ! সে যে ওজঃ-
 স্বরূপ, তেজঃস্বরূপ, অনন্ত বলস্বরূপ । আমাকে মানতে তোমাদের
 কাউকে কঁহুঁ বলি না, বলি আমার কথা শুনতে, কথা মত কাজ
 কতে, আমার কার্যের অনুকরণ কর্তে । যা ভাববে, যা বলবে, ত
 কার্যে পরিণত করবে । তুচ্ছ প্রাণ, যায় থাক্ । এক দিন ত যাবেই
 তবে সত্যকে নষ্ট কর্বে কেমন ! মরিয়া হ'য়ে লেগে যাও । বলবান্
 হও, অভী হও, সত্যবান্ হও, সত্য স্বরূপ তাঁতে লীন হও,
 ইহাই ধর্ম ।

বীৰ্য্য রক্ষা করার

উপায়, ঐ সম্বন্ধে নানা
 কথা ।

এই দেহের মূলবস্তু বীৰ্য্য রক্ষার জন্য
 অনেকে অনেক রকম কৃত্রিম ও কঠোর
 নিয়মাদি পালন করে থাকে । ঐ সব
 নিয়মে ইন্দ্রিয়জনিত চিন্তাই বেশী । ফলে সফল না হ'য়ে
 কুফলই হয়ে থাকে । উদ্দেশ্য ভালই হোক, আর মন্দই হোক,
 যে বিষয়ে যত চিন্তা করা যায়, উহা ততই বেড়ে গিয়ে থাকে ।
 কামেন্দ্রিয় দমন কর্তে চিন্তা করায় উহা ও ক্রমশঃই বেড়ে যাবে ।
 তাই, ওসব ত্যাগ করে সৎ পবিত্র বিষয়ের চিন্তা কর, ধ্যান কর ;
 তাতে সৎ ও পবিত্র হবে । কামের পান্ডা ও দেখা যাবেনা ।
 লিঙ্গটা ত একটা দ্বার স্বরূপ । যেমন নাক-কান-চোখ-মুখ দ্বারা
 শ্বাস প্রশ্বাস খাওয়া দাওয়া দেখা শোনা প্রভৃতি ক্রিয়া ও চলে,
 আবার কফ কাশি, খোল প্রভৃতি পটা মল ও সময় সময় বের
 হয়ে যেয়ে থাকে ; তদ্রূপ লিঙ্গ দ্বারা প্রস্রাব নিঃসরণের ক্রিয়া
 চলে, আবার সময় সময় হয়ত একটু বীৰ্য্য ও বের হয়ে যায় ।

আর প্রত্নাবেষর সঙ্গে বিন্দু বিন্দু বীৰ্য্যপাত ত নিয়ত হচ্ছেই ; তবে আর ও বিষয়ে অত লক্ষ্য রাখার কি আছে ? এ ভাগ নিঃসঙ্গ ত সর্ব প্রাণীরই স্বাভাবিক-শারীরিক ধর্ম । তবে উহা রক্ষা কর্তে হলে কৌশলে প্রকৃতির সহিত লড়াই করে জিত্তে হয় । ঐ বিষয়ে, ইন্দ্রিয় জনিত কাম বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও সংযত থাকতে হয় । আর সত্য বিষয়ে এত চিন্তা কর্তে হয় যে ও চিন্তা যেন স্বপ্নে ও আস্তে সময় না পায় । কাম (কর্ম) না থাকলেই কাম আসে । সর্বদা কাজ নিয়ে থাকবে, তবেই কাম আস্তে ফুরুদ পাবে না, আপনা হতেই দমে যাবে । এই তোমরা এখানে ২০২৫ জন বসে সংকথা আলোচনায় আছ । যে ১ ঘণ্টা প্রত্নাব না করে থাকতে পারে না, সে এখানে এখন এমনই তন্ময় হয়ে আছে যে, এই ৪৫ ঘণ্টা কাটিয়ে গেল । ও বিষয় মনেই নাই । যাই এই মনে হোল, অম্নি দেখ ঐ ওরা কয়জন নে না উঠে আর থাকাতে পারেন না, উঠে গেল । কারণ এখন মন বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে গিয়ে পড়েছে । কীর্তনে, ধ্যানে, বুদ্ধে প্রভৃতি তন্ময়ের ভাবে এ সব হয়ে থাকে । অর্থাৎ যতদিন উহা রক্ষা কর্তে না পারবে, ততদিন এত কর্ম করবে, এত নাম করবে, সাধুসঙ্গ করবে, সদগ্রন্থ পাঠ করবে যে, ইন্দ্রিয় জনিত চিন্তা, পুরুষের দ্বী বিষয়ক, স্ত্রীর পুরুষ বিষয়ক চিন্তা মনে আদৌ স্থান না পায়, সময়ের কাঁক না পায় । তবেই ঠিক হয়ে যায় । ২০২৫ বৎসর পর্তুগীষ যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্তে পারেন তবে আর ভয় নাই । তদ্বার, বীৰ্য্য এমন গাঁড় হয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় যে, ইচ্ছা

না কুলে আর টলে না। আর অত কেন হে! তুমি ত শরীর নও।
তুমি যে আত্মা, অনন্তশক্তি আত্মা, নির্বিকার চৈতন্য স্বরূপ আত্মা।
হৃৎকারণে উন্মুক্ত ছুনিয়ায় চরে বেড়াও! সব পালায়ে যাও।
তুমি যে মহাবীর! মহান্ আত্মা! আত্মার আবার কাম ক্রোধ
আছে নাকি হে? আত্মা আবার কিছুব বাধ্য নাকি? সে যে
স্বাধীন—সে যে পূর্ণ মূল্য—পূর্ণ শুদ্ধ।

ছেলে মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে মাতাপিতাই সম্পূর্ণ দায়ী।
এক পণ্ডিত বলেছিলো—মাতাপিতা স্বর্গ হতে এই নিষ্পাপ
আত্মা এই পরলোকে টেনে আনে, আর গুরু তাকে চৈতন্য
করিয়ে পুনঃ স্বস্থানে পাঠিয়ে দেয়। তাই পিতামাতা হতে
গুরুই অধিক পূজ্য। খাটিকথা, ২০ বৎসর পর্য্যন্ত সম্ভান-
গণের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া, আর ঐ কাল পর্য্যন্ত নিজেদের
অথবা উপযুক্ত গুরুর নিকটে রেখে চরিত্রবান্ করা ব্রহ্মচারী করা
প্রত্যেক পিতামাতাবই অবশ্য কর্তব্য। তবেই সেই পুত্রঃ পুত্র-
পুত্রঃপুণ্য কর্মের দ্বারা পুণ্যমক নরক হতে উদ্ধারের আশা
করা যায়; নতুবা শুধু গণ্ডায় গণ্ডায় কিচকের দল সৃষ্টি করলে,
বরং নরকের দ্বার আরো প্রশস্ত করা হয়।

যৌবন নদীর প্রথম বেগ যদি একবার শাস্ত হয়ে যায়, তবে
আর ভাঙ্গার ভয় থাকেনা। কিন্তু প্রথমেই যদি বাঁধ ভেঙ্গে
যায়, তবে আর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এসেও তাকে টেকেতে পারেনা।
যে মানুষ হয়, সে ছোট হতেই মানুষ হয়। জগতে যত যত
মহাপুরুষ জন্মেছেন, বাল্য হতেই তাদের জীবন-চরিত্র দৈয়রী হয়ে

এসেছে। ২০ বৎসর পর্যন্ত ও যারা অটুট ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্ত্তে পারে, কালে তারা ও চেষ্টা কল্লৈ মানুষ হতে, মুক্ত হতে পারে, অগ্নজন্মকেও মুক্ত কর্ত্তে পারে। বিন্দুস্থ, ক্ষনস্থ চেওনা। অনন্ত অসীম শান্তি সমুদ্রে ঝাঁপ দাও।—

কণেক স্থখের তরে স্বাস্থ্য ভঙ্গ যেই করে

অকালে জীবনে মরে সেই মূর্থ হীন।

মাতৃজাতি মাতৃভাবি পিতৃজাতি পিতৃভাবি

সচ্চরিত্র সদা রবি,

না হইবি সর্বনাশা নেশার অধীন॥

সত্য মানুষকে দেবতা করে। দেবতা আর কে? যার

সত্য মানুষকে দেবতা করে। বাক্য সত্য, চিন্তা সত্য, কার্য্য সত্য, সেইই
সত্য, সেইই দেবতা। সত্যের সমান তপঃ

নাই, মিথ্যার সমান পাপ নাই।—

“সাঁচ বরোবর তপ নহি, বুট বরাবর পাপ,

জাকো ভিতর সাঁচ হৈ, তাকো ভিতর আপ্।”

যাঁর ভিতর সত্য বিরাজ করে, তার মধ্যে তিনি আপনি বিরাজ করেন। যে সর্বদা সত্য চিন্তা করে, সত্য বলে, সে এমনই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, সে সত্য বই আর কিছুই দেখতে পায় না। তার তখন “সত্যময়ম্ এ ব্রহ্মাণ্ড” দৃষ্ট হয়। এই রূপেই সে সত্যরূপে সত্যময় হয়ে যায়। এই সত্য্যচার, সত্যানুষ্ঠান রুত্তে কুত্তেই সাধুদের বাক্য হইয়া থাকে। তখন তাদের মনের জোর এত প্রবল হয় যে, ইচ্ছা মাত্র এই ধরাকে

ওস্ট্র পালট' করে দিতে পাবে । ধারণাশক্তি এত বেড়ে যায় যে, ভুলক্রমে একটা মিথ্যা বিষয় ধরলে ও তা সত্য হয়ে যায় । এক সময় কালিকানন্দ নামে জনৈক সাধু বহুকাল হিমালয়ের ক্রোড়ে থেকে সাধনা করে সিদ্ধ হয়ে একদিন যাই নিম্ন প্রদেশে এসেছে, অম্নি দেখে রেলগাড়ী যাচ্ছে । তাঁর হিমালয়ে গমনের সময় দেশে রেলগাড়ীর আবিষ্কার হয় নাই । তাই নূতন একটা বস্তু দেখে তার সখ হোল জিনিষটা কি যায় ভাল করে দেখি । আর যাই তার মনের মধ্যে ইচ্ছা হয়েছে “থাম্”, অম্নি গাড়ী থেমে গেল । তখন সাধু গাড়াতে উঠে সব কল-কজা ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখে, চলে যাবাব জন্ম যাই আবার সঙ্কেত কর্লে অম্নি চলে গেল । এই ত তোমাদের মত কত কত মহাপুরুষ দয়াপরবশ হয়ে সত্যনিষ্ঠ মনের জোরে কত কান্ডাল জনের ছুরারোগ্য ব্যাধি সকল আরোগ্য করে দেন, জীবন দান দিয়ে দেন । এসব মনের বলে, সত্য ইচ্ছাশক্তির বলে হয়ে যায় । ইচ্ছার সঙ্গে, ভাবের সংগ, বাক্যের সঙ্গে, কাব্যের সঙ্গে, সত্যবল এমনভাবে প্রবিষ্ট যে স্বাধীনতা, পবিত্রতা, মুক্তি, প্রেম-সমাধি পষ্যন্ত এনে দেয় ।

ওগো, সং হও, সংভাবো, সংকার্য্য কর, সত্যময় এ জগৎ প্রত্যক্ষ কর । এ ছুনিয়াটা যে একখানা বিরাট দর্পণস্বরূপ । এর সম্মুখে যে সাজে, যে ভাবে, যা নিয়ে দাঁড়াবে—তাহাই দেখতে পাবে । যদি সং ও ভাল হও. সং ও ভাল বলেই একে দেখবে । আর অসং ও অসাধু হলে সবই তোমার নিকট

অসং ও অসাধু রূপে দেখা দেবে। ভাল চাও ত'আগে ভাল হও। ভাল না হইলে বাঁধবে বিষম লেঠা।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একবার সাধুসেবার আয়োজন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে দাস্তিক ভীম একজন সাধু আনতে বৈরুল। সারাদেশ খুঁজে খুঁজে একজন ও সাধু দেখতে না পেয়ে ফিরে এসে বিরক্ত হয়ে জানালে—“না কৃষ্ণ, সাধু পাওয়া গেল না। এদেশে সাধু নাই।” তখন শ্রীকৃষ্ণ কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বলেন “কি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে সাধু নাই? তুমি বলে কি?” তখন যুধিষ্ঠির স্বয়ং বাইবে গিয়েই সামনে রুহিদাস মুচিকে দেখে সাধু বলে ধরে আনলেন। ভীম ঠাট্টা করে বলে—“মুচি যদি সাধু হয়, তবে আর এ দেশে অসাধু কে? আচ্ছা ধর্ম্মরাজ যখন সাধু বলে এনেছেন, তখন যদি সেবার সময় স্বর্গে ঘণ্টা বাজে তবে বিশ্বাস কন্তো পারি।” তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং ধর্ম্মরাজের আদেশে সেবার আয়োজন হ'ল। রুহিদাস ভোজনে প্রবৃত্ত হ'ল, কিন্তু কৈ ঘণ্টা ত বাজে না! শ্রীকৃষ্ণ বলেন—“তোমরা ওকে সাধু বলে বিশ্বাস করে সেবা করাচ্ছ না, তবে ঘণ্টা বাজবে কেন? সাধু সেবাইত হচ্ছে না। তখন যুধিষ্ঠিরের ধমকে সকলেই সাধু বলে বিশ্বাস কল্লে, কারণ ধর্ম্মরাজের বাক্য ত আর মিথ্যা নয়! নিশ্চয়ই উনি সাধু। তখন আবার পাক হোল, রুহিদাস আবার ভোজনে বসল, কিন্তু ঠিক এবারও ত স্বর্গে ঘণ্টা বাজল না। আবার শ্রীকৃষ্ণ বলেন—“সাধু বলেও সকলে মানলে, কিন্তু দ্রোণদী ওঁকে মুচিজ্ঞানে যশস্বতরে পাক করে খেতে দিলে।

‘তাই জ্ঞানদ্বার সহিত ভোজন দেওয়ায় ঘণ্টা বাজল না।’
 তখন আরার সকলে ভয়-ভক্তি বিহ্বল চিত্তে তাকে পুনঃ ভোজনে
 বসালে, আর গলবস্ত্রে সাধুদের স্তুতি-গুণগান কন্ডে আরম্ভ করে
 দিলে। এবার যাই রুহিদাস গ্রাস নিলে, অমনি ঘণ্টা বেজে
 উঠল, গ্রাসে গ্রাসে বাজতে লাগল। তখন সকলে কেন্দে
 কেন্দে সাধুনিন্দার প্রায়শ্চিত্ত কন্ডে লাগল। তাই কেনো—
 সাধু না হলে সাধুকে ধরা যায় না, চেনা যায় না। সৎ হও, সাধু
 হও ! “সত্যমেব জয়তে”—সত্যের জয় চিরকালই।

জ্ঞান-যোগ ।

এই আমরা হাত নাড়ছি, কথা বলছি, মনে কত চিন্তা
 আন-বোধ। কচ্ছি, এতে আমাদের একটা শক্তি বা সত্তা
 অনুভব হচ্ছে। যখন মৃত্যু হবে, ঐ শক্তি বা সত্তা দেহ ছেড়ে
 চলে যাবে। অথবা থাকলে ও প্রকাশ থাকবে না, তখন এ দেহ
 হতে কেউ কথাও বলবে না, নড়চড় ও করবে না, কোন চিন্তাও
 করবে না। এই স্বপ্রকাশ শক্তি বা সত্তাকেই আত্মা বলে।

এই আত্মাকে কেউ দেখতেও পায় না, দেখাতেও পারে
 না। 'উহা' ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য, মাত্র উপলব্ধি সাপেক্ষ। এই আত্মা
 অবিনশ্বর, নির্বিকার, নিরাকার—সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতম। উহা
 সর্বত্র, স্ফাট সর্ববিশরীরে কেন্দ্ররূপে সদা বিद्यমান।

পরমাত্মায় আর জীৱাত্মায় তফাৎ কেমন? যেমন এক
 অনন্ত অখণ্ড আকাশ। উহা ঘটের মধ্যে ঘটাকাশ, মঠের
 মধ্যে মঠাকাশ, নাম প্রভৃতি ধরেছে, কিন্তু যেখানে
 গিয়ে উহার যে অংশ যে নামই ধরুক না কেন, উহা যে
 অনন্ত অখণ্ড আকাশ, সেই অখণ্ড আকাশই রয়েছে। মট-মট-
 পট ভেঙ্গে গেলেই প্রকাশ হয়ে পোল। জীৱাত্মা পরমাত্মাও
 তদ্রূপ। 'উহা' এক অনন্ত অখণ্ড। 'কেবল' কইরের মায়ায়

আবরণে পৃথক্ দেখাচ্ছে। যখন ওর যে অংশ যে শরীরে আবদ্ধ হয়েছে, তাহাই তখন সেই শরীরের জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়েছে। মায়ার আবরণ খুলে গেলেই স্বরূপ প্রকাশ হয়ে গেল। আপনস্তের স্বরূপ, জীবাত্মার স্বরূপ, উহার যে কোন এক দিকেব এক অংশের একটু জ্ঞান হলেই সেই এক অথও পরমাত্মার জ্ঞান এসে পড়ে। এই জীবাত্মায় পরমাত্মায় একত্ব বোধ—একত্ব হওয়াই জীবনের চরমোদ্দেশ্য।

যার এই আত্ম-জ্ঞান জন্মেছে, উপলব্ধি হয়েছে, সে এ দেহটাকে আশ্রয় করে ও থাকতে পারে, আবার উহা ত্যাগ করেও দিতে পারে। আত্ম-বোধ—আত্মোপলব্ধিই মুক্তি। এরূপ মুক্ত পুরুষের দ্বারা জগতে কোন অশ্রায় হতে পারে না। বরং তারা অনাসক্তভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে জগতের উপর উপকার কর্ত্ত্ব করে যেতে পারে। কস্মের কোন দাগ, ফলাফলে তাদের জড়াতে পারে না। তারা যে নির্বিকার-নিষ্কল-পবিত্রাত্মা স্বরূপ! রাজর্ষি জনক—বিদেহ জনক ছিলেন, এইরূপ একজন জীৱমুক্ত কস্মী-মহাপুরুষ। তাঁর দেহের সঙ্গে, রাজ্য সম্পদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই মাত্র ছিল না। আবার তিনি যথাযথ ভাবে উহার সদব্যবহার, সদ্চালনাও করে গেছেন। ঐনৈক মুনি একদিন তাঁর নিলিপ্ততার পরীক্ষা কন্তে এসে বল্লেন—“মহারাজ, আপনার জনক-নগরী আগুন লেগে পুড়ে গেল।” তিনি উত্তর কল্লেন—“তাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কি আছে হে! সমস্ত রাজ্য কি এ দেহটা পর্য্যন্ত ধ্বংস হলেই বা আমার কি ধ্বংস হবে ?

আমার ধ্বংস ও নাই, বৃদ্ধি ও নাই, অপর ও আমার কিছুই নাই, নিজের ও আমার কিছুই নাই। আমি ত আর সামান্য দেহ সর্ব্বশেষ নই ? আমি যে সকল, সকলই যে আমার। আমি যে স্বয়ং, সেই পরমাত্মাই। দেহে অবস্থান কর্ত্তেও দেহের সহিত তাঁর কোন সম্বন্ধই ছিল না, বলেই তিনি বিদেহ নামে—বিদেহ-জনক নামে পরিচিত।

পদ্মপত্রের যেমন জলেই জন্ম, জলেই স্থিতি, আর জলেই লয় হলেও উহাতে জলের দাগ লাগে না, তদ্রূপ আত্মজ্ঞানী মুক্তপুরুষের এই সংসারেই জন্ম, সংসারেই স্থিতি, আবার সংসাবেই দেহ লয় হলেও সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ, সংসাবেব কোন দীর্ঘই তার লাগে না।

কোন কোন নব্য শিক্ষিতের মুখে শুন্তে পাই—শ্রীকৃষ্ণ অত্র গোপিনী নিয়ে কি নিব্বলক ছিলেন ? “হারে অবোধবা” তিনি যে একশত অষ্টগোপী, ষোল শত রমনী নিয়ে ক্রীড়া কর্ত্তেন তোরা তই এক জন নারীর মন যোগাতে পারিসনে। আর উনি নারীর মন যোগায়ে ও অত যুদ্ধ-বিগ্রহ, সাম্রাজ্য শাসন প্রভৃতি কার্য্য অক্লেশে করে গেলেন। একি সামান্য শক্তির কাজ তিনি হলেন, পূর্ণ-চৈতন্য শক্তি, আর গোপীরা তাঁর শুদ্ধা-মুক্তি দায়িনী—প্রেমরূপিনী শক্তির বিলাস। তাদের আবার ময়লা ? অরী সবই যে স্ফিকাম-নিঃসঙ্গ-চিরমুক্ত। ব্যাসপুত্র শুকদেব বৃহৎসর মাতৃ জঠরে থেকে, পূর্ণ যৌবনে মুক্তাবস্থা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মেই স্বভাবে বিভোর

হুয়ে দিব্যদৃষ্টিতে উন্মাদক যে দিকে পা যায়, সেইদিকেই বেগে ছুটে চলে। সম্মুখাৎ মারামুক্ত পুত্র গৃহত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন দেখে, মায়াবদ্ধ বৃদ্ধ ব্যাসদেব তাকে সংসারে কিভাবে আনবার জন্য ভিড়ি তার পিছু পিছু ছুটলেন। উভয়ে এইরূপে চলতে চলতে যমুনা জারে এসে পড়লেন। গোপীগণ বস্ত্র, তীবে রেখে নগ্ন দেহে তখন জলকেলি করছিলেন। শুকদেব তাদের সম্মুখ দিয়ে উল্লাসাবহাৱ চলে গেলেন, কিন্তু যখনই ব্যাসদেব দেখানে আসছেন দেখলেন, তখনই তারা স্ব-স্বাস্তে লজ্জানত মুখে স্ব-স্ব-বস্ত্র পরিধান করেন। এই আশ্চর্য্য কাণ্ডে দেখে ব্যাসদেব হঠাৎ খেমে গিয়ে তাদের লজ্জার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তারা উত্তর দিলেন—“আপনার উল্লস পুত্র যৌবন-মংশল হলেও তার যে ভজ-জ্ঞান জন্মেছে, সে যে আত্ম-জ্ঞানী, মুক্ত পুরুষ, তার দেহ সম্পর্কিত জ্ঞানই নাই, তাই তার শরীরে কাম বেধি নাই, আর ভজ্ঞস্ত কামাদেরও লজ্জা আসে নাই। আর আপনি শতবর্ষের বৃদ্ধ স্মৃতি হলেও আপনাতে আশঙ্কি আছে, কাম আছে, তাই আমাদের লজ্জার কাণ্ড হয়েছে। শুকদেব যে নির্বিকার, তারে দেখে বিকার আসবে কেমন করে? তাই একজন বৃদ্ধ পুরুষের দর্শন হলেও কোটি কৈশিকী জন্মের বৃদ্ধন আলগা হয়ে যায়। তার যত্নরূপে স্নান-দর্শন হয়েছে—সেইই ভজ্ঞজ্ঞানী। তারই মারে তখন কামনার নিবৃত্তি হয়েছে, কোপের সমাপ্তি হয়েছে। তখন ক্রোধ-উপেক্ষা-দোষ-সমাপ্তি।

রোজ রোজই প্রাণী সকল মরছে, অথচ যারা বেঁচে আছে তারা ভাবছে—আমরা অমর, স্বর্গের দক্ষিণ দোর বেঞ্চে রেখে এসেছি, এই যে ভুল, এই ভুলই মায়া । সকলের হতে স্বীয় পুত্র কন্যা, পতি-পত্নী, ভ্রাতা-ভগ্নী প্রভৃতি রক্তমাংসীয় সম্পর্কীয়দের প্রতি যে অত্যধিক মমতা-টান, অথচ সকলেই সেই এক আত্মা, ইহার জ্ঞানের অভাবই মায়া । অজ্ঞানই মায়া, জ্ঞানই মুক্তি । অজ্ঞান ঘের অমাবস্তা, জ্ঞান পূর্ণিমার ফুল জ্যোৎস্না । জ্ঞান মুক্তির পথে, ভগবানের পথে টেনে নেয়, আর অজ্ঞান বন্ধনের দিকে কন্ঠের দিকে টেনে রাখে । এই টানাটানি নিয়েই ত এই জীব সংসার চক্র চলছে ।

ভগবানকে দয়াময় বলি, কিন্তু তিনি জীবের প্রতি সহজে সন্মত হন না । মা যেমন নানা খেলনা দিয়ে শিশুকে ভুলায়ে রেখে নিজে আড়ালে থেকে নিজের নিজের কাজ করে যান । কাজ শেষ হলে, অথবা কোন বেপরোয়া দুঃখ ছেলে খেলনা টেল'নায় না ভুলে মা বলে কেন্দে, ছুটে যায়, তখনই মাত্র মা তাকে কোলে নিয়ে থাকেন । তদ্রূপ ভগবান ও জীবকে সংসারের মধ্যে নানা রং তামাসার খেলায় মত্ত করে রেখেছেন । যে অভুলো জ্ঞানী ছেলের তাঁর প্রতি প্রবল টান এসেছে, তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে, কেন্দে পাগল হয়ে ছুটে পড়েছে, —সেইই মাত্র তাকে পেয়েছে, তাকেই তিনি কোলে নিয়েছেন ।

সোজা কথায় বলে না?—‘জোর যার মুল্লুক তার’। জোর করে যে চাইতে পারে সেই পেয়ে থাকে। খাবার সময় যে সম্ভানটি বেশী আকার ও জোর অবরদস্তি করে, ‘মা’ সমদৃষ্টি হলেও তাঁকেই সকলের আগে বেশী ও ভাল খাবারটা দিতে বাধ্য হয়ে পড়েন। ভগবানও আমাদের পুত্র কণ্ঠা স্বামী প্রাণ রূপ নানা রকমের মায়ায় বন্ধন দিয়ে বন্ধ করে বশ করে রেখেছেন। যে মুক্তি না পেলে বুঝবে না বলে জেদ করে দাঁড়াতে পারবে সেই কেবল মুক্তি পাবে। এ দুনিয়াটাই চালাকি বজ্জাতির দ্বারা চলছে, আর সে বেটা বাদ পড়বে কেন? সেও সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, কিন্তু যে তাকে পাবো বলেই জেদ করে বসে, সেইই তাকে পেয়ে থাকে, সেইই তাঁর ভাব সম্যকরূপে অবগত হয়ে থাকে। যে জোর করে দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারে—“আমি মুক্ত, আমি আত্মা, আমি চৈতন্য” সে তখন মুক্ত হয়ে যাবে। ‘আমি’ সব। আমার মধ্যে তাঁর পূর্ণ বিকাশ। আমি সবারই মধ্যে রয়েছে, এক বিন্দু ধূলিকণাও তাহাতে বাদ নাই”। এইরূপ যে তেজের সহিত বলে, চিন্তা করে, ধারণা করে, কার্য্য করে সেই স্বভাব হয়ে যায়; তারই মায়া কেটে যায়, মুক্তি নেনে আসে।

মনই সব করে, জলই যেমন কাদার সৃষ্টি করে, আবার জলই উহাকে ধৌত করে দেয়; ঐরূপ মনই সব বন্ধন এনে দেয়, আবার মনই সব বন্ধন কেটে দিয়ে মুক্ত করে দেয়। এক মনেরই গতি বহু উচ্চ কড়ু নিরে।

সুগা-লজ্জা-ভয় এই ত্রিতাপ, মায়ার ত্রিবেড়ী । 'এই বেড়ীর' একটি দ্বার মুক্ত কন্তে পায়েই, সব দ্বারই খোলা হইয়া যাবে । সব মূর্ত্তিই যে আমি, কার লজ্জা কর্বে ? সবরূপই-যে, আমার কোন্টারই বা নিন্দা কর্বে, কোন অঙ্গেরই বা ঘৃণা কর্বে ? অনন্ত মূর্ত্তিতে যে আমিই বিরাজমান ! আমাকেই আমি ভয় কর্বে ? 'এইখানেই ত মজা ! এইই মায়া—এইই মুক্তি ! এইরূপে সর্বদা আত্মোপলব্ধি কন্তে কন্তেই ত্রিতাপ ছালা ভবের বন্ধন কেটে যায়, মুক্তি লাভ হয় ।

কোন কিছুতে টান বা আসক্তি না থাকাই জীবমুক্তি স্বর্ণ শৃঙ্খলই হোক, আর লৌহ শৃঙ্খলই হোক, বন্ধন কল্পে যেমন সহজে মুক্ত হওয়া যায় না ; তদ্রূপ সৎই হোক, আর অসৎই হোক, পাপ, পুণ্য, ভালমন্দ যে কোন বিষয়েই বিন্দুমাত্র টান বা আসক্তি থাকিলেও মুক্ত হওয়া যায় না । বন্ধন বড় ভয়ানক । সবই ত্যাগ কর্তে হবে । তবে প্রথম পুণ্য ধরে পাপকে শুভ ধরে অশুভকে ত্যাগ করে করে শেষে শুভকেও ত্যাগ কন্তে হবে । শুভাশুভ, পাপপুণ্য কিছুই চাই না । অযাচ্ছ্রা-অকামনা, অনাময়ওম্ ।

'দেহ ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত মায়া একেবারে ত্যাগ হয় না । সময় সময় উদয় হয়, কিন্তু ভগ্নদন্ত সর্পের মত মুক্ত পুরুষের আর কোন ক্ষতি কন্তে পারে না । শরীরের সহিতই মায়ার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । মায়া'কে আশ্রয় করেই তাঁর 'সব লীলা খেলা কিনা ? মায়া না থাকিলে এ জগৎ থাকত না । কোন অনুভূতিই হোত না । জগতের অস্তিত্বই এই মায়া ।

আবার ভাঙে রহস্য কি জান ? সেই মহামায়ার কৃপায়ই জীব তার হাত হতে অব্যাহতি পায়। তার কৃপা না হলে, তোমায় ছেড়ে না দিলে তুমি যেতে পারো না। মহামায়ারই এ জগৎ ! এ জগৎই মায়াময়, তোমার ছয়টিই ইন্দ্রিয় আছে, তুমি উহার দ্বারা জগৎকে একরূপ দেখছ, যার উহা হতে কম বা বেশী আছে সে তদ্বারা কম বা বেশীরূপে জগৎ রহস্য অবগত হইছে। ইহা বুদ্ধিমানের নিকট একরূপ, মুখের নিকট আর একরূপ, ধনীর নিকট একরূপ, জাবার দরিদ্রের নিকট আর একরূপ দেখাচ্ছে। যার ইন্দ্রিয়গণ ও শক্তি যেরূপ, সে সেইরূপই বস্তুতঃ এ জগৎটাকে দেখছে। কেবল যে মুক্ত, সমাধিযুক্ত সেইই এ জগৎ রহস্যকে মায়াকে জানতে পেরেছে। তাই জগৎ বলে তার কোন অস্তি-নাস্তির বোধই হচ্ছে না। সে স্বয়ং স্বভাবময় রয়েছে। আগে এই মায়ার—প্রকৃতির উপাসনা কর। উহার মধ্য দিয়াই, উহার হাত দিয়াই উহার হাত হতে মুক্ত হতে হবে। কত মহাপুরুষ, কত মুনিঋষি পর্যন্ত এই মায়াকে, এই বিশ্ব প্রকৃতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ডুবে গেল। সর্বদা চক্ষু মূদে এই মহামায়াকে দর্শন কর্বে, “এই প্রকৃতির ধ্যান কর্বে, চিন্তা কর্বে, আর মুক্তির জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা কর্বে—“হে মায়াকৃপিনী দেবী, আমায় মুক্ত কর মা, আমায় মুক্ত কর”। তবে তার কৃপা হলে বন্ধন খুলে যাবে। এর এত শক্তি যে, জীবকে একেবারে অর্ধঃপাতে নিয় ও যেতে পারে, আদার নিমেষ মধ্যে পরিবর্তন করে উঠে,—মক্ষমায়ে

পর্যন্তও নিয়ে দিতে পারে। তোমার সাধন ভঙ্গ্য কর্তে ইচ্ছা হচ্ছে, শাস্ত্রালোচনা, সাধুসঙ্গ কর্তে ইচ্ছা হচ্ছে, মক পেতে ইচ্ছা হচ্ছে, এ ও মায়ায় প্রেরণা। আবার চুরি করে, অন্তায় করে সুখী হতে ইচ্ছা হচ্ছে এও সেই মায়ারই প্রেরণা, তারই শক্তি। বলো—“মায়ী—মায়া—মা—মা”, সব দূর হয়ে বাবে। ওঁ মা!

সহ-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণ। ঐ গুণ ভেদে জীবের অবস্থা গুণত্রয় ও জীবের ও তিন প্রকারের। যখন তমঃপূর্ণ থাকে, অবস্থা ভেদ। তখন তার কুৎসিত কার্য, কুৎসিত ভাবই বেশী ভাল লাগে। সে সর্বদা বদ্ধ হয়ে থাকতে, দাস হয়ে থাকতেই অধিক ভালবাসে। তারপর রজঃগুণ যখন প্রবল হয়, তখন সে কিছুতেই আর বদ্ধ থাকতে চায় না, কারও নিকট মস্তক অবনত কর্তে পারে না, স্ত্রী লজ্জা বোধ করে; সে তার সম্মুখে কোন অন্তায় কর্ম দেখতে পারে না, তখনই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেয়, সেই সমস্ত কর্তব্য কর্তে, দুনিয়া সন্তোষ কতে চায়। রাজার ভাব তার ভিতর আসে বলেই তাকে রাজসিক ভাব বলে। রাজার গুণ রজোগুণ।

অতঃপর, সহগুণ। সহগুণে—সাত্বিকভাবে একেবারে শাস্ত—স্থির—পবিত্র! তার মুখে বেশী বাক্য শ্রুয়ে না, চোকের চাহনি স্থির হয়ে যায়। তারে দেখলে হিমালয়ের স্থায় গভীর, সমুদ্রের ন্যায় অউল, সূর্যের ন্যায় তেজস্কর এবং চন্দ্রের ন্যায় শিথিল বলে মনে হয়। সে একে একে সমস্ত জগতের সজ্জ্ব বিলীন হতে চলেছে। তার আমিত্ব স্বামীত্ব দাসত্ব তখন

কোথায় চলে যায়! সর্বত্র এক ভূমি দর্শন করে। আর, তাঁর পূজা করা, সেবা করা, তাঁতে প্রেম করা ভিন্ন তার অন্য কোন কৰ্ম্ম করারই শক্তি থাকেনা। সাম্য তখন তা'তে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করে। এইরূপে সর্বভূতে ব্রহ্মদশীকেই বেদে ব্রাহ্মণ বা সত্ত্বগুণী বলেছে। “ব্রহ্ম জানাতি যঃ স ব্রাহ্মণ।” ব্রহ্মকে যে জেনেছে, সেই-ই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ অভেদ, এইখানেই গুণের শেষ। এর পর যা, তা গুণাতীত—নিগুণ পরব্রহ্মাবস্থা।

কিন্তু জেনো, এই ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণ ঔরশে জন্মে না। ব্রাহ্মণ অবস্থায়—জনন-পালন-মারণ ক্রিয়া চলে না। রজো-তমোগুণের সময়ই জনন-পালন-মারণ ক্রিয়া সম্ভবে। ব্রাহ্মণ নিষ্ক্রিয়াবস্থা। ব্রাহ্মণ পুত্র এ কথাই অবিরোধী। ব্রাহ্মণ কি এত সস্তারে! কোটির মধ্যে ও দু'চারটি মিলে' কি না সন্দেহ'। ব্রাহ্মণেরই প্রতি শব্দ দেবতা। আর এর বিরুদ্ধ ভাব যা, তা আত্মরতাম ভাব। আত্মরের তমঃগুণ প্রধান। এরা সকল রকম অন্যায় ঘৃণিত কৰ্ম্ম করতেই চির অভ্যস্ত। এরা দানব। সত্ত্বগুণী দেবতা।

শাস্ত্রে দেবাত্মরের কথা, দেবাত্মরের যুদ্ধের কথা বর্ণনা আছে। সর্বকালই এ যুদ্ধ চ'লে আসছে। দুষ্টিগণ সকলেরই অপকারের জন্য সদা বাস্তব। আর শিষ্টিগণ, সকলেরই মঙ্গলের জন্য সদা সর্বকাল প্রস্তুত। 'উহার্তে' তারা স্বেচ্ছা বরণ করে নিহত খুদী। দস্যুরা যেমন সর্বদা দস্যুত্ব কচ্ছেই, আর রাজকর্মেচারীরাও

সর্বদা তাদের শাসন কস্তে চেঁকা কচ্ছেই, শিষ্টদের বাঁচিয়ে রাখতে চেঁকা কচ্ছেই, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন পক্ষই ত হটে নাই ! যুদ্ধ চলছেই, এ অনন্তকাল চলবেই । রক্তোত্তেজের ধন্দ-
থেমে গেলে যে সবই থেমে যায় ! স্থিতি লোলা লয় পেয়ে যায় ।

এই যুদ্ধে যেমন সর্বদা বহির্জগতে চলছে, অন্তর্জগতে ও তেমন চলছে । প্রতি দেহেই কতকগুলি সহগুণ সম্পন্ন দেব-
শক্তি, কুগুলিনী চৈতন্যশক্তিকে জাগাতে চাচ্ছে, মুক্ত কস্তে চেঁকা পাচ্ছে, যেখান হতে এসেছে পুনঃ সেখানে পৌঁছে দেবার চেঁকা কচ্ছে ; আর কতকগুলি তমঃগুণ সম্পন্ন আত্মরিক শক্তি আবার সেইরূপ উহাকে দাবায়ে রাখতে, বন্ধ করে রাখতে চেঁকা করছে । এ ও ঐ দেবাসুরের-সুরাসুরেরই যুদ্ধ । এ জীবনটাই একটা যুদ্ধ স্বরূপ । এ যুদ্ধ মিটে গেলেই শাস্তি—মুক্তি । কিন্তু দেহ-ত্যাগেই এ যুদ্ধের শেষ হয়না, এরা আবার অন্য দেহে আশ্রয় করে লেগে যায় । কুগুলিনীর জাগরণ, সত্যের জয় না হওয়া পর্য্যন্ত নমিটে না । তবে সত্যের জয় চিরকালই । সত্যমেব জয়তে । দু'দিন আগে, আর পরে, আর কিছু

দেবতা কথায় ভয় পেয়ো না । মানুষই দেবতা । অন্য কেউ নয় । ভাস্করের চার হাত, পাচমাথা বিশিষ্ট মেটে প্রতিমা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেওনা । ও সব হোল ঐ ঐ শক্তিসমূহের কাল্পনিক বাপকাটি মাত্র । মানুষই দেবতা—ব্রহ্মাবিশ্ব শিব, রাম-কৃষ্ণ-চৈতন্য । মানুষের মধ্যেই তাঁর লীলাধারা । মানুষ-

রূপেই ভগবান্ । বত্র জীব, তত্র শিব । বাহ্য জীব, তাহাই
পশিব । ওম্ শিবো—ওম্ শিবো ।

২' ব্রহ্ম-উপলব্ধির বস্তু । উহাকে বিচার যুক্তি কি শাক্ত-পাঠ
ও ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড । জারা অবগত হওয়া কি পাওয়া যায় না ।
তবেবল যখন উহার শক্তির বিকাশ হয়, তখন বুঝতে পারা যায়
উহা তাঁর কার্য্য, তাঁর শক্তি । শক্তি ও প্রকৃতি একই । ঐ
শক্তি বা প্রকৃতির লীলাই ব্রহ্মের সক্রিয়াবস্থা, আর ব্রহ্মের ঐ
সক্রিয়াবস্থাই ব্রহ্মাণ্ড ।

পরব্রহ্ম ত্রিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া তাঁর লীলা প্রকাশ
কচ্ছেন ।—জড়শক্তি, জড়চেতন শক্তি আর শুদ্ধ চেতন শক্তি ।
ক্রিতি-অপ্-তেজঃ-মকৎ-ব্যোম, তথা কাঠ, পাট, মৃত্তিকা, মৃত-
দেহ প্রভৃতি জড়শক্তি । মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ক্রিমি প্রভৃতি জীবন্ত-
ওলো জড়চেতন শক্তির অন্তর্ভুক্ত । এবং জড় ও জড়চেতন হীন
সূক্ষ্ম দেহী সমুহ চৈতন্য শক্তির অন্তর্ভুক্ত । এই তিন শক্তির
অতীত নিত্যমুক্ত—নিত্যচৈতন্যস্বরূপ যে পরমাত্মা তাহাই পরব্রহ্ম ।

পরব্রহ্ম সর্বদা সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিরাজ কচ্ছেন ।
যেমন সব পাথরেই অগ্নি আছে, সব জায়গাই শূন্য আছে, ধা-
মারলেই অগ্নি ছলে উঠে, শূন্য প্রকাশ হয়ে পড়ে, তদ্রূপ সব
দেহেই সর্বত্রই ব্রহ্ম আছে, কিন্তু জ্ঞান-ভক্তিরূপ মূলধারা
জোরে ছা না মায়ে প্রকাশ হন না । ভগবান্ জীবিত প্রতি
সহস্র শুলভ নয় গো ! জ্ঞানোদয় হলে জানবে—তিনি সাকার—
নিরাকার—সর্ববাকারই ।

ব্রহ্ম আর ব্রহ্মাণ্ড যেন সাগর আর তার ঢেউ । সাগর যখন স্থির থাকে, তখন আর ঢেউয়ের অস্তিত্ব থাকে না । আর যখন-অস্থির হয়ে উঠে তখনই বিভিন্ন ভাবের বিচিত্র চিত্রের ঢেউ সকলের সৃষ্টি দেখা যায় । ব্রহ্ম ও ঠিক সেইরূপই, যখন নিষ্ক্রিয়, তখন—অনন্ত অময়-অব্যক্ত-শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র—নির্বিকার পূর্ণানন্দ স্বরূপে উপলব্ধি হয় । আর যখন সক্রিয়াবস্থায় দেখা যায়—তখন সৃষ্টি স্থিতি লয় যুক্ত, সুখ-দুঃখ-ভাল-মন্দ বস্তু যুক্ত সদাপরিবর্তন—বৈচিত্র্যপূর্ণ রহস্যযুক্ত বলে মনে হয় । বড়ই তামাসা ! এ বড়ই রহস্য ! ব্রহ্ম যখন একই, তখন এগুলোও ব্রহ্মেরই স্বরূপ-ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের অণু-ব্রহ্মাণ্ড । অভ্যাসানুকারেই উহার রূপ দৃষ্ট হয় না, বোধে আসে না । এ যে ঐ অতল বারিধিরই নাচ, তরঙ্গ, তোলপাড় ! এই উঠছে, এই পড়ছে, এই হচ্ছে, এই মিশছে, এই—এভাবে আব সেভাবে আর কি । কিন্তু বস্তু একই ই'তে শাহি ডুল । এ রাজ্যে এলে আর কিছুই নাই—ব্রহ্ম-ময়ই তখন ।

পশুপতির আবার এ জগদব্রহ্মাণ্ডকে দুই ভাগে ভাগ করে বিচার করেছে । এক মনোজগৎ বা আশুর্জগৎ আর বহির্জগৎ বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড । প্রতি দেহই এক একটা ব্রহ্মাণ্ড, এক একটা জগৎ । এই তোমার দেহজগতে মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়গণ নিয়ে সূক্ষ্ম-রূপে যে সূক্ষ্মভাবে লীলা চলছে—এ সূক্ষ্ম বা আশুর্জগৎ । আর কৃত্ত বরমের ক্রিমি-কীটগণ, রোমাবলী, নাড়ী-শিরা-রাস্তিক-প্রভৃতি স্থূল রূপের জিনিষ নিয়ে যে স্থূল-লীলা চলছে,—এ

স্থূল-ব্রহ্ম বহির্জগৎ । ক্রৌঞ্চকোটগণের সমষ্টিই ত তোমার দেহের কারণ । তুমাদের দেহই তাদের বিরাট ব্রহ্মাণ্ড । আবার আর এক প্রকারের বিরাট বিশ্ব-জগৎ বা বহির্জগৎ ও আন্তর্জগৎ আছে—এই পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রগণ ও মহাকাশ নিয়ে ।

স্থূল শরীরে আবদ্ধ স্থূলবুদ্ধি বিশিষ্ট মানবের পক্ষে সূক্ষ্ম জগতের ধারণা আনা অসম্ভব, বড়ই কঠিন । এই অস্থি-মজ্জা মেনন্নয় যে স্থূল শরীর, যখন ইহা ত্যাগ হয়, তখন ও সূক্ষ্ম শরীর থাকে । মুক্তি না এলে সূক্ষ্ম শরীরের নাশ হয় না । এই সূক্ষ্ম শরীরের নাশই মুক্তি । যদি ইহা না হোত, তবে ত মৃত্যু হলেই মুক্তি হোত ! আর কোন চেষ্টামিচি, ভাব্য-ভাবনার দরকারই ছিল না । কিন্তু স্থূল শরীরকে মৃত্যু, আর সূক্ষ্ম শরীরের ত্যাগকে মুর্ত্ত বলে । এই যেমন স্থূল শরীরে স্থূল বিশ্ব-জগতের কত স্থূল বিষয় দেখ্ছ, যার সূক্ষ্ম শরীরের সূক্ষ্ম জ্ঞান-চক্ষু খুলে গেছে, সে ও সেইরূপ কত সূক্ষ্মজগতের কত সূক্ষ্ম বিষয় দেখ্ছে । এই তোমরা আমার কথা খুব জনোযোগ্য দিয়ে শুন্ছ, পিছন হতে যদি কেউ তোমাদের ডাকে, সে ডাক কণ্ঠে এসে পৌঁছাবে, স্নায়ু উহা মনের নিকট নিয়ে এসে দাঁড়ায়ে থাক্বে কিন্তু মন এখান থেকে না ফেরা পর্য্যন্ত উহা শুন্তে পাবে না । যখন কেউ ভাবস্থ হয়ে রয় বা মনোপ্রাণ নিয়ে কোন বিষয়ে ডুবে থাকে, তখন তার সমস্ত স্থূল ইন্দ্রিয় খোলা থাকল বটে, কিন্তু কোন কিছু দেখ্তে শুন্তে বা অনুভব কল্পে পাবে না । সন্ধ্য সময় এমন হয় যে, স্নান পর্য্যন্ত ও এসে পৌঁছায় না । এই মন হোল

সূক্ষ্ম, এ হতেও সূক্ষ্ম জ্ঞান—পরমাত্মা রয়েছেন। আর, এই সব জন্মগায়, এই আকাশ স্থানে তোমরা মনে করে পারো, কিন্তু ওর মধ্যেও অসংখ্য সূক্ষ্ম জীবদেহী রয়েছে। প্রতি স্থানে প্রাণসে কত জীব বাইরে বেরুচ্ছে ভিতরে প্রবেশ কচ্ছে তা কে নির্ণয় করতে পারে? সূক্ষ্ম জীব বায়ু হতে আকাশ হতেও হালকা, কিন্তু শক্তি বিশিষ্ট। আবার দেখছনা, কত স্ত্রী কি পুরুষকে পরী-পেড়োতে পেয়ে থাকে। কত আজগুবি ক্রিয়া করে, বহু দূরের খবর এনে দেয়, মনের কথা বলে দেয়, রোগের ঔষধির ব্যবস্থা করে দেয় ইত্যাদি। এ সব কি? কেউ কি চোঁকে দেখেছে? শুনেছ মাত্র। যখন ঐ সূক্ষ্মদেহীরা কোন স্থলদেহে বিশিষ্ট প্রাণীর ওপর চেপে বসে, কার্য্য করায়, তখন তার শক্তি দেখে কতকটা বুঝো, বা মনে একটা ভেবে নাও। তা বলে ওদের বড় মনে মনে করে বসো না। ওদের অনেকের শক্তির মানবের চেয়ে কম। যাদের শক্তি মানবের কাছাকাছি, তারাই মানবের কাছে এসে থাকে; দুর্বল বা প্রবল শক্তির আশে না। মানুষের মধ্যে যারা দুর্বল, অশুচি, লোভী, কামী তাদের ঘাড়েই লোভ, ঘেরায়ে এসে চেপে বসে; কত কিছু করায়। এই সূক্ষ্ম দেহীরা পূর্বে স্থল দেহে আবদ্ধ ছিল, পরে কোন কারণে স্থল দেহ হতে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে মহাবিপদে পড়ে যায়। মুক্তও হতে পারে না, পুনঃ স্থল দেহ নিয়ে জন্মাতোও পারে না। তাই ঐরূপ দোদলবাক্স হয়ে এখানে, সেখানে, এ শরীরে ও শরীরে ঘুরে বেড়ায়। এইরূপে কেও বা কোন মহাপুরুষ দর্শনে তাঁর কপাট

মুক্ত হয়ে যান, কেও বা কারো দ্বারায় তীর্থক্ষেত্রে শ্রদ্ধা, মসজিদে
নামাজ কি গির্জায় তার জন্ত উপাসনা করায় পুনঃ জুল দেহ
গ্রহণের উপায় করে নেয়। যত সব “বারটার” দেখা, ও সবই
ওদের কার্য্য ওরা মুক্ত বা পুনঃ শরীব গ্রহণের উপায় করার জন্ত
এ সব কার্য্য্য কচ্ছে। কিন্তু এ ভিন্নও অনন্ত জগতে কত অনন্ত-
রূপ জুল-সুক্ষ্ম দেহী যে রয়েছে, তা কে নির্ণয় করবে ?

বিশ্রুপ বা সর্বত্র ব্রহ্ম ত সব জায়গায়ই রয়েছেন। যার জ্ঞান
ব্রহ্মদর্শন। নেত্রের ঠুঁসি খুলেছে সেই দেখতে পাচ্ছে। চন্দ্র
সূর্য্য-গ্রহ-তারা, জল-বায়ু অগ্নি ব্যোম সবই সেই ব্রহ্মশক্তির
বিকাশ, মহামায়ার লীলাভঙ্গি। যখন হোমাব দেহ জগতে অসংখ্য
জীব বাস কচ্ছে, যেমন চোকপোকা, কানাপোকা, চঁইপেপকা,
কুমি প্রভৃতি যা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। শোমবা আবার এই
পৃথিবীদেহে বাস কচ্ছে। পৃথিবী আবার বিশ্বজগতের দেহে বাস
কচ্ছে। সে বিশ্বজগৎ আবার কোন মহা দ্বন্দ্বজগতের মধ্যে আছে,
তা কে বলবে ? কাঁকা, শূন্য স্থানেও অসংখ্য জীবের বাস যখন
তাতেই প্রমাণ হয় যে,—ব্রহ্মময়ম্ এ ব্রহ্মাণ্ড। যেখানে যেখানে
মায়ার বাতাস বইছে, সেখানে সেখানেই ব্রহ্মসমুদ্রের ঢেউ বেড়ে
উঠছে। আর তা দেখে সব ভাবছে—এ বুঝি সব। কারণ
তখন অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে। অশান্ত মনে—শান্ত সমুদ্রের
অস্তিত্বই বোধ হচ্ছে না। “এই যা কিছু দেখতে পাও না পাও,
শুনে বা ধারণা কতে পারো, না, প্যার,—সবই সেই বিরাট
ব্রহ্মেরই রূপ। এইরূপ ভেবে ভেবে, ধ্যান করে করে, তদায়

হয়ে গেলেই-বিশ্বরূপ বা সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয় । ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভক্তজ্ঞানী অর্জুনের একবার এইরূপ দর্শন হয়েছিল, এ কি আর' বলবার বোঝাবার জিনিষ ? কঠোর কৰ্ম্ম, কঠোর তপস্যা কন্তে হয়, তাঁর কৃপা লাভ কন্তে হয়, তবে তাঁর কৃপায় মায়া চলে যায়—সব প্রকাশ হয়ে পড়ে ।

ওগো, তুমিই যে তাহাই ! সেই পরব্রহ্মই ! তত্ত্বমসী ! তৎ-স্বমসি ! তোমার পুত্রের মধ্যে, কন্যার মধ্যে, পতির মধ্যে পত্নীর মধ্যে পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে, আত্মীয় অনাত্মীয় সমস্ত মানব মণ্ডলীর মধ্যে, পশুপক্ষী জীবজন্তু সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, উহা ব্যাপিয়া, উহা সাজিয়া যিনি বিরাজ কচ্ছেন, তিনি ও যা, তুমি ও তাই । সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ মহাব্যোমের মধ্যে যিনি, তিনি ও যা, তুমি ও তা, আমি ও তাহাই ! সমস্তই এক একস্বর । এই ভাবা, উপলব্ধি করাই তত্ত্বমসী । এ অবস্থায় পৌঁছিলে তাকে কেউ বলে মুক্ত হয়েছে, কেউ বলে ভগবদর্শন হয়েছে, আত্মদর্শন হয়েছে ইত্যাদি ।

এ অবস্থায় পৌঁছবার পূর্বে সমস্ত প্রাণী ও সমস্ত বস্তুতে শত্রুতা ভাব ত্যাগ হয়ে বন্ধুত্ব ভাব এসে যায় । এইরূপে যখন শত্রুতা ন্যস্ত হয় সারা জগৎ বন্ধুতে ভরে উঠে আর এই বন্ধুতে এমন গাঢ় হয় যে, দৈত বোধ একেবারে চলে যায়—অদৈত ভূমিতে একেত্রে মিলে যায় মিশে যায় তখন শত্রু ও থাকে না মিত্র ও থাকে না, জন্ম-মৃত্যু, কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম ও থাকে না । কেবল স্বাভাবিক অব্যক্ত নিত্য পূর্ণানন্দে—আনন্দ স্বরূপে বিরাজ করে ।

নৈহাই মহাসমর্পণ—মহানির্ব্বাণ ! ইহাই স্মৃন্ত জীবের একমাত্র
 'কাম্য—প্রাপ্য, শেষগতি । কিন্তু এ বড় অদ্ভুত রহস্য যে, আপন
 অজ্ঞান রূপ মায়া'র আবরণে আপনি আপনাকে গুটি পোকাক
 মতন বদ্ধ করে, আবার আপন স্বরূপ দেখবার জন্য বেরতে চেষ্টা
 কচ্ছে ! এই নিত্যশাস্তির জন্য সকলেই ঘুরে বেড়াচ্ছে । কেউ
 চুরি কচ্ছে, কেউ ইন্দ্রিয় সন্তোগ কচ্ছে কেউ উপবাসী হয়ে কঠোর
 তপঃজপ সাধন ভজন কচ্ছে, ধর্ম্ম কচ্ছে, বেদ-বেদান্ত তীর্থ তীর্থে
 খুঁজছে ! কিন্তু এত পাওয়াব নয়, এ যে নিত্য পাওয়া ! ঐ
 নিত্যানন্দ, নিত্যস্বরূপই যে আমি । এক অদ্বৈতই যে আমি !
 আমিই সেই ! আমিই সেই ! সোহম্ সোহম্ ওম্ ॥ (ভক্তগণ
 সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি ।)

ত্যাগ ও সেবা।

‘সর্ব কৰ্ম্ম ফল ত্যাগং প্রাপ্ত্যন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ’

সর্ব কৰ্ম্মের ফল ত্যাগকেই বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ ত্যাগ বলে
ত্যাগ ও ত্যাগের থাকেন। পুত্র কলত্র, আত্মীয় কুটুম্ব, বিষয়-
অধিকারী) আশয়, সব ছেড়ে দিয়ে একমাত্র সেই পরমাত্মা
ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই ত্যাগ। মনের মধ্যে কোন প্রকার
কামনা-বাসনা না থাকাই ত্যাগ। সম্রাসী শুকদেব, আর গৃহস্থ
রাজা জনক, এরা দু’জনেই ছিল দুটি ত্যাগের আদর্শ।
আসল কথা, যে যেক্রমেই থাক্, অনাসক্ত থাকটাই প্রকৃত
ত্যাগ। ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানুষঃ, ত্যাগই মানুষকে অমৃতত্ব
লাভ করায় দেয়। আসক্তিই বন্ধন মৃত্যু, ত্যাগই মুক্তি-
অমৃতত্ব।

যার কিছু আছে, সেইই কিছু ত্যাগ করতে পাবে। যার
কিছু নাই, সে কি ত্যাগ করবে? বুদ্ধের রাজত্ব ছিল, পত্নীপুত্র
ছিল, সত শত দাস দাসী ছিল, বহুত ধন-সম্পত্তি-ঐশ্বর্য ছিল,
তাই তিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছিলেন। লালাবাবুর অত বড়
জমিদারী ছিল তাই তিনি উহা ত্যাগ করায় সুন্দর মানাইয়ে
ছিল। এঁদের জিনিষ ছিল, শক্তি ছিল, ভোগ ও হয়ে গিচ্ছল,
তাই ও সব ত্যাগ করে আর গ্রহণ না করে পেরে ছিলেন।
জুগতে এরূপ ত্যাগের একটা সন্ধান আদর্শ দিয়ে গেছেন। আর

এই তোমাদের মধ্যে কয়েকজনে ত্যাগী সাজবার জন্য আমাকে বিরক্ত করে তুলেছে। তোমাদের কি আছে যে, তা ত্যাগ করবে? রোজ খাট, রোজ খাও, ঘরে ছেলেপিলে মা-বাপ আছে, তাদের খাবার-পরিবার দিতে হয়। ভাঙ্গা ঘর দিয়ে জল পড়ে। পরণে লেংটি, তার আবার ত্যাগ করবে কিহে? আগে রোজগার কর, সম্পত্তি কর, ভোগ কর, শেষে ভোগে যখন বিরক্তি আসবে, তখন আপনি সব ত্যাগ হয়ে যাবে! তা না, এদিকে কষ্টের ভয়ে, ধর্মের নামে বৈরাগী সাজলে, আর ওদিকে ছেলেপিলে পরিবারের সমস্ত না খেয়ে ম'লো। ভারী ধর্ম কল্লে ত! এরে ত্যাগ বলে না, এ ভণ্ডামী। আজকাল এইরূপ কতকগুলো ভণ্ড আল'সে কষ্টের ভয়ে পেটের দায়ে বৈরাগী সেজে এ দেশটাকে পবিত্র-ধর্মটাকে জাহান্নামে দিচ্ছে, জনতের নিকট হেয়ত্বের প্রমাণ করে দিচ্ছে। তাই বলছি--আগে দুনিয়া ভোগ-দখল কর, শেষে ভোগে বিহ্বল এলে ত্যাগ করিও। ভোগের শেষেই মাত্র ত্যাগ। আর বাইরে ত্যাগ দেখালে কি হবে? ও ত্যাগের জন্য ত্যাগ নয়, ও-যে নাম-বশঃ ভোগের জন্যই ত্যাগ, ভণ্ডামী, কৃত্রিমত্ব, অন্তরে অন্তরে ত্যাগের নামই প্রকৃত ত্যাগ। ঐ রুজানন্দ, শুকদেব, এরা ত্যাগ নিয়ে সন্ন্যাস নিয়েই জন্মেছে। এদের কথা স্বতন্ত্র! এরূপ যুগে যুগে জগতে দু'একটি মাত্র এসে থাকে। এরা সাধারণের আদর্শ নয়, কারণ এদের আদর্শ কে, কয় জনে খর্তে পারে? এরা শুধু মানব শরীরে কতখানি ত্যাগ সঙ্কল্প, তাই দেখানোর খাঁর। সাজসজ্জা জনক ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, হরিঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু, চিত্তরঞ্জন এই সব মহাপুরুষ জগতের প্রকৃত ত্যাগের সেবার আদর্শ। এদের মত হয়ে চল্লই ধর ঠিক চলা হবে। এরাই প্রকৃত ত্যাগী। এদের ত্যাগ-ভোগই প্রকৃত ত্যাগ-ভোগ।

আজকাল এক দল ভেকধারী বৈষ্ণবের অত্যাচারে দেশটা অস্থির হয়ে উঠেছে। মহাশত্রুর এমন পবিত্র প্রেমধর্ম, তাহা একেবারে বিকৃত করে ফেলেছে। তাই আজকাল বৈষ্ণবের নাম শুনে-ও লোকে নাসা কৃৎন করে উঠে। তাদের ভোগে প্রবল আসক্তি, কিন্তু ভয়ানক আলসে, কর্ম কতে 'একেবারেই নারাজ! তাই করে কি, ধর্মের নামে এক একজনে দুই তিন জন বৈষ্ণবী নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরে আর জয়রাধেকেষ্ট বলে ভিক্ষা করে। ওদের একদম ভাসিয়ে দেবে। ভিক্ষা দেবে বুড়ুকে, দীন-দরিদ্র, আর্ন্ত আতুরকে আর যে মহাত্মা পরের জন্তু দেশেদেশে ঐরূপ দীনদরিদ্রের সেবার জন্তু ভিক্ষা করে, তাদের দেবে। . . . কর্মক্ষম ব্যক্তিকে নিজের উদরপূর্তির জন্তু এক কণাও দেবে না। ওতে অধর্মের প্রশয় দেওয়ারূপ মুহাম্মদকে পতিত হতে হয়। সাধু যে, সম্যাসী যে, তার নিজের জন্তু ভিক্ষা করিতে হয় না, কত জনের স্বচ্ছা দেওয়া দানের দ্বারা সে কত কত দরিদ্রনারায়ণের সেবা করে, জায়গায় বসে।

যার ঠিক ঠিক ত্যাগ ভাব এসেছে, সে নিজের জন্তু কোন কর্ম বর্ষ্য ত্যাগ করি। কর্তে পারে না। কর্তব্যের শক্তিই তার লোপ পেয়ে যায়। . . . কিন্তু তখন তাঁর কর্মের গতি ফিরে যায়—মোড়

‘ক্ষিরে’ যায় । আর তখন ঠিক ঠিক কৰ্ম্মের আরম্ভ হয় । এই কৰ্ম্মকেই সেবা বলে । ইহাই প্রকৃত কৰ্ম্ম । আর তখন, তার এই কৰ্ম্ম সহস্র গুণে বেড়ে যায় । স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন আদর্শ কৰ্ম্মী, আদর্শ ত্যাগী, আদর্শ সন্ন্যাসী আদর্শসেবক । তাই তাঁর দ্বারা অত সব কাজ হয়ে গেল ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে এমন আদর্শ-ত্যাগ-শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, যে, তা চিরকাল সর্বজীবের সর্বপ্রকারের উপযোগী । তিনি শত শত রমণীর মধ্যে থেকেও নিষ্কাম, রাজরাজেশ্বর হয়েও নিম্পৃহ এবং মহাবলী হয়ে ও মহাযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে সারথী মাত্র । কিছুই ছেড়ে যেতে হবে না । অনাসক্ত হয়ে সবই আয়ত্তে রেখে তার সদ্ব্যবহার কতে হবে । সব তা পেতে হবে । কিন্তু তাতে যেন পেয়ে না বসে । সব তাকে অধীনে রাখতে হবে, তার অধীন হতে বাধ্য হতে হবে না ।

যে প্রকৃত ত্যাগী, সে সর্বদা সর্বাবস্থায়ই নির্বিকার শান্ত শিব স্বরূপ । যার অন্তরে প্রথম প্রথম ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাব আসছে, তার কিছুকাল সাধুসঙ্ঘ করা ভাল । নতুবা পিছলে পড়বার ভয় আছে । একবার পেকে ঠিক হয়ে গেলে, গরম-হংসদেবের সোণার ঘটা হয়ে গেলে, আর মাজাঘষার দরকার হয় না । যেথা ইচ্ছা, সেথা যাও, ভয় নাই ।

সর্বপ্রকার আসক্তিই দুঃখ, সর্বপ্রকার ত্যাগই শান্তি ।

আসক্তিই দুঃখ, প্রায়ই সবে ভাবে ধনসম্পত্তি হলেন সুখী
ত্যাগই শান্তি । হওয়া যায় । বহু সুন্দরী রমণী যার সেই-ই

বুঝি স্থখা । কিন্তু যখন সে ধনী হয়, আর কিছুকাল উহা ভোগ করে, শেষে যদি তাতে জিজ্ঞেস কর—কেমন আছ ? শুনবে—যখন টাকা পর্য্যাপ্ত এত ছিল না, তখন বড় ভাল ছিলাম । এখন চোর-ডাকাতের ভয়ে রাত্রে নিদ্রা হয় না, মাংসা-মৌকন্দমায় ঘুরে ঘুরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে, চারিদিকে শত্রু দাঁড়ায়েছে, সোয়াস্তি নাই । আর পারি না । ভগবান্ এখন আমায় নাও, মুক্ত কর । বহু স্ত্রী ওয়ালাকেও জিজ্ঞেস কর্বে, সেও ঐরূপ দৌর্য্যধাস ফেলে উত্তর দেবে । জগতের রীতিই ঐরূপ । যেটা পাওয়া গেছে, সেটায় বিতৃষ্ণা, যেটা পাওয়া যায় নাই, সেইটারই আকাঙ্ক্ষা । কিন্তু যখন জগতের সব পাওয়া, পাওয়া হয়ে যাবে, জগতের নিত্যধন নিত্য পাওয়া ভগবান্কে পাওয়া হবে, মাত্র তখনই সেই দিনই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি, ভোগের সমাপ্তি নিত্যশান্তি ।

যারা আমাকে পেয়েছে, এমন কি যে যে যতক্ষণ এখানে রয়েছে, ততক্ষণ কোন ভারনা নাই, কোন কামনা নাই, কোন উদ্বেগ ও নাই,—একেবারে তন্ময়—বিভোলা সব । এইরূপ সজ্জ কন্তে কন্তে যাদের গতি বদলে গেছে, ত্যাগের নির্ব্বাণের দিকে চলে গেছে, তাদের আর কোন ভাবনা নাই । তারা পূর্ণশান্তির খোঁজ পেয়েছে, আর ভুলে পড়বে না । কিন্তু যাদের এখনও সে ভাব স্থায়ী হয়ে বর্ত্তে নাই, তাদের পুনঃ পুনঃ আসতে হবে, এই সঁর্ব সাধুদের সঙ্গ বর্ত্তে হবে । আমিও কোন তন্ত্র মন্ত্র সাধন ভজ্ঞন জানি নাহে ! আমি এই সাধুদের সঙ্গে পড়ে থাকি, এই সাধু সঙ্গে থাকাই আমার নিত্য স্বাভাবিক ধর্ম্ম ।

এতেই আমরা নিত্যআনন্দ এখানে পুনঃ পুনঃ এসো, বসো সাধুর বাতাস গায়ে লাগায়ো ; এখানে দর্শনে, স্পর্শনে আলাপনে মুক্তি-মহাশ্রমলাভ ।

যখন যে ভাবে থাকো, তাতেই সমুদ্র থেকো । আত্মতৃপ্তিই সর্ব সাধনার সিদ্ধি, নিকামভাব, আপ্নাতে আপ্নি থেকো মন যেযো নাক কারো কাছে । তাঁর ইচ্ছার পর তার দিয়ে ভেসে ভেসে চলে যাও ।

জগতে যে যত পূর্ণভাবে ত্যাগ কতে পারে, তার নিকট তাহাই তত ঠিক ঠিকভাবে বাধ্য হয়ে তার পূজা কতে ফিবে আসে । তাই বলি—যদি পেতে চাও, তবে আগে দিয়ে দাও, সব দিয়ে দাও । ওগো, দিলেই পাওয়া যায়, পার করলে পার আছেই ।

সাধুর ভাব না জেনে ভঙ্গী ধরা ভাল নয়, তাতে মহৎ নিন্দা ভাব না জেনে ভঙ্গী করা হয় । অনেক দুর্বল কুঁড়েরা ভাবে—ধরা ভাল নয় । সাধুদের সকলেই আদর সম্মান করে, সেবা শুশ্রূষা করে, আর আমাকে কেউ পোছেও না, দূর করে তাড়ায়ে দেয় । কি করি—আমি সাধু হবো, অর্থাৎ সাধুর 'পোষাক' নেবো, এই ত আমারই মত কত দুষ্ক ইঠাৎ একটা রজিন কাপড় পরে, গায়ে আলুথেল্লা নিয়ে তিলক মালা ধরে সাধু বনে গেল । 'এইরূপ ভেবে সেও গেলুয়া' প্রভৃতি নিয়ে সাধু সাজে বেরিয়ে পড়ে আর যত অকাযের একশেষ করে ছাড়ে । কত ভাল লোককে সেকাঁফি দিয়ে সর্বনাশ করে । কিন্তু এ ভণ্ডামী

আর কয়দিন চলে ? দিন কয়েক পরেই ধরা পড়ে যায়, আর লাখি চড়ে যায়। আর এই ভণ্ডেমের ব্যবহারে প্রকৃত সাধুগণের প্রতিও সামান্যের অবিশ্বাস জন্মে যায়। এতে তার এই যে সাধুনিন্দা পাপ আসে তা খণ্ডন হওয়া বড়ই কঠিন। আবার কেহ কেহ বলে যে, হরিনামের কাচ ও ভাল সাধুর ভান ধরাও ভাল। ঐ ভাবে ক্রমে ক্রমে সাধু হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ ভাবে সাধু হতে বড় দেখা যায় না। আত্ম-প্রবঞ্চনা হতে কেহ সং হতে পারে না, ও শুধু যুক্তি তর্কমাত্র। ধর্ম হোল প্রাণের জিনিষ, প্রাণে প্রাণে অনুভবের বস্তু ! প্রাণ থেকে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উহা জেগে ওঠে। তর্ক যুক্তির মধ্যে ধর্ম নাই। ভাব না জেনে ভগ্নী ধরা ভাল নয়, ওতে মহৎ নিন্দা করা হয়।

ত্যাগ আর সেবা ভাঙে নয়। উহা একই বস্তু। একই ভাগ ওৎসব। একই বস্তুর এদিক, ওদিক মাত্র। যে যত বড় বস্তুর এদিক ওদিক মাত্র। 'ত্যাগী, সে তত বড় সেবক জানবে।' যে ত্যাগ ভ্রত নিয়েছে, সেবাত্রত ও তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। যে সেবা কচ্ছে, ত্যাগ সে করে নিয়েছে আগে। নিজে কিছু ত্যাগ কল্লেই, অপরকে কিছু দেওয়া যায়। অপরের অভাব বোধ না থাকলেই অন্তের অভাব মোচন করা যায়। অপরের অভাব মোচন করার নামই সেবা। 'আবার অন্তের অভাব মোচন, কন্তে কন্তেই নিজের অভাব-সম্ভাব হইয়ে যায়, নিজের অভাব-অভাব বোধই থাকে, অভাব-বেয়ে ভাব এসে থাকে। ইহাই

যথার্থ ত্যাগ, ইহাই যথার্থ সেবা । ইহাতেই প্রেম, ইহাতেই শান্তি, ইহাতেই মোক্ষ নিরবাণ ।

যার সেবা ছেড়ে শুক ত্যাগী সাজে, তাদের প্রকৃত ত্যাগী বলে জানিবে না, জানবে ও ভগ্নাত্মী কুড়ুমী । একমাত্র যেই আত্মায়ই তৃপ্ত, আত্মায়ই সম্বৃত, আত্মায়ই যার রতি জন্মেছে, প্রেম জন্মেছে, যে আত্ম-স্বরূপ হয়ে সমাধি ঘরে গিয়ে বসেছে, সেই-ই মাত্র কর্ম বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছে, অপরে নহে । নিজের জগতই হোক, পরের জগতই হোক, কর্ম কর্তেই হবে । কর্ম গুণ্য হয়ে জীব বেশীদিন শরীর ধারণ করে থাকতে পারে না ।

গরীব দুঃখী দোরে এসে দাঁড়ালে, সাধ্য মত এক মুষ্টি চাল

একটি পয়সা বা একখানি বস্ত্র দিয়ে দিবে ।

সেবার স্বরূপ ।

কখনো ফিরিয়ে দিও না । আর পারত,

বড় বড় বিশ্বাসী সংপ্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু বা এককালীন মোটা দান করবে । এতে পুণ্য আছে । এ ভাল । কিন্তু সেবা এরও উপরে, অনেক উপরে । অণু না চাইলেও তার অভাব খুঁজে গিয়ে পূরণ করে দেওয়া, অথবা তার পরিচর্যা শুশ্রূষা করা । প্রাণের থেকে করা । কষ্টে ইচ্ছা হয়, আনন্দ হয় রলে করা—অকারণ করা । একেই বলে সেবা । এতে পুণ্যের ও উপরে প্রেম লাভ হয় । নিজের যখন সাধ্যো কুলায় না, তখন অন্যের দ্বারে গিয়ে, কষ্টকে সাধী করে, ভিক্ষা করে করে ও আর্ন্ত-আতুর, দীন দরিদ্রের সেবা করবে । সেবার মতন আর জগতে কোন বড় কায নাই ।

দানের মধ্যে ধর্ম-দানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান । কারণ ধর্মই মানুষকে সুখ দুঃখ বদ্ব্যভূত সেই নিত্য নিত্যানন্দ ধামে চিরকালের জন্য নিয়ে যায় । এ দানে চিরকালের মত তার সব অভাব দূর হয়ে যায় । এর পরে জ্ঞান দান । জ্ঞানে মানুষকে সুখ দুঃখ ভীল মন্দ বোধ জন্মায়ে ধর্মরাজ্যে পৌছাতে দেয় । তৃতীয় শ্রাণ দান এবং চতুর্থ শেখ দান, অন্নবস্ত্র দান । কিন্তু কোন দানই নিকৃষ্ট নহে । দান কথায় কি উচ্চ কি মহান ভাবোদ্বোধক । এই সব নিম্নস্তরের দান কর্তে কর্তেই উচ্চস্তরের দানে প্রবৃত্তি ও শক্তি আসে । এই দান, ত্যাগ, সেবাকে এক কথায়, জীবের সর্বপ্রকার অভাব-অপূর্ণতা মোচন করে পুনঃ চৈতন্য করান বলে । এই সেবা ধর্মই মহাদেব শিব, মহামানব বুদ্ধ সর্বস্ব ত্যাগ করে, ভিক্ষু সেজে ছিলো । রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, সমস্ত জাগতিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে বেরুলে বলেছিলেন ঈশ্বর-ফিখর, ভগবান্ টগবান বলে আর আমায় বিরক্ত কর কেন ? আমি একা ভগবান হওয়ায় তোদের লাভ কি ? সকলেই ভগবান । তুই ভগবান, আমি ভগবান ও ভগবান্, দুনিয়ার যা কিছু সবই ভগবান । সব ব্রহ্মময় । ভগবান্ ভগবান্ বলে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ ? শুনছ না ঐ আমার সেই বিবেকানন্দের আনন্দের বাণী--“বহুরূপে সন্মুখে তোমার ছাঁড়ি কোঁথা খুঁজিছ ঈশ্বর ? জীবের প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ॥” সর্বরূপে তাঁর সেবা কর । সব আমি, সব আমি, অনন্তরূপে আমি । অনন্তরূপে আমার সেবা

কর । তুমি ও, আমি, আমি ও তুমি । সেবা, সেবা, প্রেম-প্রেম-
অনন্ত প্রেম ওম্ (সমাধি) ।

সেবায় চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হলে চিত্ত-স্বরূপ ভগবানকে
সেবার চিত্ত শুদ্ধ হয়, পাওয়া যায় । পরম্পরের প্রতি সাহায্য
কৃত শুদ্ধ হলে ভগ- সেবা করাই যে মানব ধর্ম । যে একটি
নকে পাওয়া যায় । মাত্র প্রাণীকে ভালবাসতে শিখেছে, সে
জগতের সবাইকে ভালবাসতে পেরেছে । চিত্তশুদ্ধ, পবিত্র না
হলে প্রকৃত ভালবাসা বর্তে না । এই তুমি যাকে ভালবেসে
ফেলেছ, সে কোন গুরুতর অন্যায় কল্লেও তুমি তাতে ক্রোধ
প্রকাশ কতে পারবে না । কারণ তুমি তোমার প্রাণের বশুতে
আঘাত দিয়ে বাঁচতে পারো না । সে ভিন্ন তোমার যে আর
প্রিয়বস্তু, কাম্যবস্তু নাই । সেই-ই যে তোমার একমাত্র যথার্থশক্তি
সে যে তোমার প্রিয়তম । তা হতে তুমি নিজকে ছোট বা বড়
বলে গর্বিত বা ঈর্ষিত হতে পারো না । তাতেই তুমি মুক্ত ।
অন্য কিছুতেই যে তোমার আর মোহ আন্তে পারে না ।
দমন্তই যখন তুমি তাতে সমর্পণ করেছ, তখন বড়রিপুর ও তুমি
আর বাধ্য নও । তোমার প্রিয়তম যাহাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার
মনে ব্যথা লাগে, এমন কোন কাজই তুমি কতে পারো না,
কারণ তখন উভয়ে এমন রূপে একত্রে দিকে পৌছেছ যে
“দীর্ঘিত ভ্রাতার ভয়ে কেহই কোন অশ্রায়ই কতে পারো না,
রুর ষাতে প্রীতির চরমোৎকর্ষ হয়, পূর্ণ মিলন হয়, সমাধি আসে
সেই সব কর্মই স্বাভাবিক ভাবে কতে আনন্দ পাও, বাহাই

কর। একরূপ পরস্পরের সেবায় এমন পবিত্রতা চিত্তশুদ্ধ ভাব আসে যে, তখন ভাল বৈ মন্দ, আনন্দ বৈ নিরানন্দের আর উদয় হয় না। . . তখনই সেই পরমানন্দময় ভগবানের সাক্ষাৎ হয়। যখন একজনের সেবায় এমন পরমানন্দ আসে, তখন তাঁর অনন্ত মূর্তির বন্ধু ভাবে সেবায় যে কি আনন্দ আসে তা আর কি বোলব! সে কি প্রেমানন্দ. কি মহানন্দ! তখন আনন্দময়েই লীন হয়ে যাবে।

অনন্ত সমুদ্রের এক স্থানের এক বিন্দু স্পর্শ কলে, যেমন সব স্পর্শ হয়ে যায়, তদ্রূপ তাঁর অনন্ত রূপের অনন্ত মূর্তির যে কোন এক মূর্তির মধ্যেই তাঁর প্রকাশ ভাব জানতে পায়েই সবই জানা হয়ে যায়, পাওয়া হয়ে যায়।

এই দেখ, আমাকে এরা যারা সেবা করে ভালবাসে, আমার দর্শনে তাদের দর্শনেন্দ্রিয় আত্মার সহিত আনন্দে নৃত্য করে উঠে, দর্শনে আত্মা পুলকিত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে; আমার কথা তাদের কর্ণে যেম অমৃত বর্ষণ হয়, আমার আত্মার ব্রাণ যেন তাদের শ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করে, তাদের রসনা যেন আমার নাম 'গানেই' সুদা, বিভোর হয়ে রয়, অন্তর বোধ দূরে থাক, আমা ভিন্ন নিজের গোধ পর্যাস্ত থাকে না। আমার সঙ্গে আমার মধ্য দিয়া সেই অনন্ত সহ্যার সূত্রে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়, আমায় হয়ে যায়, এক হয়ে যায়। আর আমিও তখন, 'একরূপ হয়ে যাই, উদের অনন্ত রূপের মধ্যে পড়ে অনন্ত ভাবের উদয় হওয়ায় অনন্ত হইয়ে অনন্তে মিশে যাই একরূপ মানবের দ্বারা. কি

আর কোন অঘ্যায় সম্ভবে ? জ্ঞাননেত্রের পর্দা যে তখন হটে যায় দেখে “যত্র জীব, তত্র শিব” ! প্রতিমূর্ত্তিই নারায়ণ ! এ ত্রকাণ্ডময়ই নারায়ণ ! আপনি ও নারায়ণ হয়ে নারায়ণানন্দে মিশে যান ।

প্রেমের অকুর হতেই সেবাস্বর্গের উদ্ভব । এই সেবাস্বর্গ সাধন কর্তে কর্তেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হয় । আর এই প্রেমের শেষই সমাধি । এই পূর্ববাস্থ্য পৌছালে আর ঈশ্বর অনিশ্চর দ্বৈত্যাধৈত বোধ থাকে না । তখন থাকে শুধু “ও” ভাব । এর শেষে যা, তা বলা কথার ওপারে—অব্যক্ত ।

যত যাগ-যোজ্ঞ, তপঃ জপঃ গ্রাস-কুস্তক, সাধন-ভজ্ঞন যাই কর, কৰ্ম্ম ভিন্ন সেবাকৰ্ম্ম ভিন্ন মুক্তি নাই । এই হরেক রূপে তাঁর সেবাই একমাত্র কৰ্ম্ম, একমাত্র সর্বকালের সর্বজীবের ধৰ্ম্ম । এধৰ্ম্মে জীবন উৎসর্গ কর, ধন্য হও ! ওঁ তৎ সৎ ওঁ !

গুরু ও সাধনা ।

গুরু কি ”

“অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।

তৎ পদংদর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকার এ বিশ্বচরাচরে যিনি ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, সেই পরব্রহ্ম—বিশ্বরূপ যিনি প্রদর্শন করান, তাঁকেই নমস্কার, তিনিই গুরু । যার দর্শনে কোটি জন্মের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, স্পর্শনে প্রেম উপজে, তিনিই গুরু । গুরুরূপে সাক্ষাৎ ভগবান্ । তাঁকে প্রহরে প্রহরে শ্বাসে প্রশ্বাসে অন্তরে অন্তরে সর্ববন্ধন প্রণাম করি, শরণ করি ।

জগতের কল্যাণের নিমিত্ত ভগবান গুরুকে জগতে পাঠায়ে দেন । গুরু শরীরে প্রকাশ হন । কিন্তু বড় আশ্চর্য্য যে, জগতে সকলেই গুরু হতে চায়, চেলা হতে কেউই চায় না । চেলা না হলে হে গুরু হওয়া যায় না । যিনি খাটি চেলা, হাজার হাজার জনের ভক্ত, হাজার হাজার লোকের মন যোগায়ে চলতে পারেন, মনের মতন হতে পারেন, তিনিই প্রকৃত গুরু । যার কথা আপনারা সকলে আহ্লাদে শুনবে, মানবে, কাষে পরিণত কর্বে, তিনিই গুরু । সকল হতে যিনি গুরু, তিনিই গুরু । গুরুগিরি বড় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য । জগতের জগৎ সকলের জগৎ সমস্ত ভাগ কর্ত্তে হবে, আপনার জগৎ কিছু রাখবে না, তবে গুরু । যে কিছু রাখে না, তার সবই থাকে ; যার কিছু নাই,

তার সবই আছে। যার কিছু আছে, তার কিছুই নাই। একটা সংস্কে চংস্কে, কতগুলো চেলা বানায়ে গুরু সঙ্গে বসো না। তাতে নির্জেও অধঃপাতে যাবে, অন্যকেও অধঃপাতে নেবে। গুরু অদর্শ মানব। তার পূর্ণত্যাগ-বৈরাগ্য, জ্ঞান-প্রেম-পবিত্রতা সত্যও ধৈর্য্যাবীর্য়্য চাই, সবদিক পূর্ণ চাই। আর এত পবিত্রতা লাভ কত্তে হবে যে, যে আসবে পাপী তাপী সব পবিত্র হয়ে যাবে। পবিত্রতাই গুরুর স্বরূপ।

গুরু গ্রহণ কত্তে
হয় কেন ? উহা
পরীক্ষা করে নিতে
হয়।

জীবমাত্রের জন্মিবামাত্র যা সম্মুখে পায়, তাই ধরে শিখতে আরম্ভ করে, জানতে আরম্ভ করে, সে চায় উহা ধরে ঐরূপ হতে, বড় হবে, উহা সন্তোষ কত্তে। উহাই তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সে যে আদর্শ সম্মুখে পাবে, তাই আয়ত্ব করবে। ঐ আদর্শ সৎ ও মহৎ হলে সেও সৎ ও অসৎ হবে, আর অসৎ হলে সেও অসৎ হবে। মানব জীবনের উদ্দেশ্য মুক্ত হওয়া, তার আদর্শ ও মুক্ত মাসুম। এই মুক্ত পুরুষই গুরু নামে অবিহিত। স্তুরাং গুরু আশ্রয় ভিন্ন গতান্তর নাই।

গুরু গ্রহণ করবার সময় বিশেষ হুসিয়ার হয়ো, বিশেষ সম্ভরণের সহিত পরীক্ষা করে নেবে। বলতে পারো—আমি আধারে রয়েছি আলোকের সন্ধান কেমনে জানব? তা হলে ত আমি চৈতন্যই হয়ে গেলাম আর গুরুর প্রয়োজন কি? কিন্তু বাইরের দোষগুণ, ভালমন্দ ত বুঝ? সেই বোধ দ্বারা বিচার করবে, আর মনে মনে বিশেষভাবে বিচার করে নেবে

যে—যাকে দেখা মাত্র আপনার বলে মনে হয়ে যায়, যেন কত কালের চিরকালের চেনা, পরিচিত, পরমাত্মায় । যাঁর প্রতিচ্ছবি মনের অন্তঃস্থলে গিয়ে ঠিক বলে পৌঁছে, সব সন্দেহ, ধাঁধা দূর হয়ে যায় । যিনি সৌম-শান্ত, পূর্ণ স্ফুৰ্ত্তন, পূর্ণ প্রেমমূর্ত্তি ! স্বচ্ছায় যাঁর শ্রীচরণে মস্তক স্নুইয়ে পড়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয় যাঁর পদে বিকিয়ে যায়, তাকেই গুরু বলে আপনার গুরু বলে জানবে গ্রহণ করবে । শত বাধা বিঘ্ন পড়লে ওঠে কবে না ।

গুরু কখনো ত্যাগ কত্তে নাই । গুরুত্যাগ মহাপাপ । গুরু চিরকাল-সর্বজ্ঞাতা, সর্ব কৰ্ম্ম কর্তা । এই জগুই গুরু পরীক্ষা করে নিতে হয় । তুমি যে বিষয় না জানো, না বোঝ এবং সাধারণে ও না বুঝে নিন্দাবাদ করে, এমন কাজও যদি কখনো গুরুকে কত্তে দেখ, তাতেও তুমি তাঁতে অবিশ্বাসী হতে পারবে না, স্বরং আরো গুঢ় রহস্য জানবার জগু ভক্তি প্রদর্শন কর । গুরু সং ভিন্ন কখনো অসং হতে পারে না । ধর্ম্ম জগতে এমন সব গুহ্য তত্ত্ব রয়েছে যে, তা বেদ বেদান্তের অজ্ঞাত : তাই প্রকৃত ভক্তের ভাব “যতপি আমার গুরু শুড়ী বাড়ী যায়, তথাপি পরম দয়ালু নিত্যানন্দ রায় ।”

যরের কোনে’ বৌ যদি স্বামীতে মন উঠে না বলে একবার নিজ স্বামী ত্যাগ করে বাজারে বেরুতে পারে, তবে কি আর তার উপপতি (স্বামীর) অভাব হয় ? কত শত শত নাক্স তার পিছনে পিছনে পয়সা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় । দিন কয়েক একটু স্থখ সন্তোগ করে । কিন্তু ক্রমেই বয়স বাড়তে থাকে, শরীর

দুর্বল হতে থাকে, আর ক্লোভ, পরিভাপ, জ্বালা আসতে থাকে । অবশেষে ভগন্দর, গনোরিয়া, গম্বা, কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ভুগে ভুগে পচে পচে নরকের দ্বার ভর্তি করে । তদ্রূপ যে একবার নিজ গুরু শক্তিসংহারণকারী লোক গুরুকে ত্যাগ কতে পারে, তার আর কখনো গুরুর অভাব হয় না । *অশান্তিরও আর অভাব হয় না । সে শুধু চেকেই যায়, খাওয়া আর তার জীবনে হয় না । কোন কিছু একটা আঁকড়ে ধরে জীবনটা কাটায়ে দাও । ক’দিন বা আর বাঁচা ? কত জন্মই কত ভাবে গেল ! এ জন্ম ও না হয় ভুল হোক । সত্য হোক, ঐ একজনের পদেই, ঐ একজনের ভাবেই ডুবে যা’ক ।

যার পদে মাথা নুইয়েছ, নুইয়েই যাও । মানুষ বলে মরগো, যদি মরে বাঁচতে পারো ! মরেছিল একদিন হুমুমান, তাই সে অমর । তার রামচন্দ্র মূর্তিতে এত বড় নিষ্ঠা ছিল যে, সেই মূর্তি বৈ আর জানতো না একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কান্দাল বিদায় কচ্ছেন । শ্রীরামচন্দ্রই যে এবার মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ হয়ে কান্দাল বিদায় কচ্ছেন ইহা জেনে, হুমুমান ও বিভীষণ দুই বন্ধু একত্রে ভগবানের কান্দাল বিদায় দেখতে একদিন, মথুরায় উপস্থিত । যে আসছে, সেইই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম কচ্ছে, বিদায় হচ্ছে, কিন্তু দুই বন্ধু সেই নবদুর্বাদল-পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্র মার্কি না দেখতে পেয়ে কেমন থমকে গেল । অন্তর্ধ্যামী শ্রীকৃষ্ণ ভাব জেনে বলেন,—অম্মিঃ! সেই ত্রেতাযুগে, রামরূপে তোমাদের সনে সীলা করেছিলেম । ” তোমরা এস, প্রণাম কর । ”

সন্দেহ কচ্ছ কেন ? তারাত্ত্রি ধ্যান করে জানতে শেলে যে-
ইনিই সেই রামচন্দ্র । কিন্তু তবু বলো—

“হে প্রভু ! শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি ।

তথাপি মম সর্বস্বঃ রাম কমললোচন ॥

যদিও শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ, এক পরমাত্মা, তথাপি
কমললোচন রামই আমাদের সর্বস্ব । তাকে বৈ আর জানি না,
আর বুঝি না । যে চরণে একবার এই মস্তক বিকিয়ে দিচ্ছি,
কেমন করে সেই এক চরণে দেওয়া মস্তক, অন্য চরণে আর বার
দেব ? হে প্রভু ! যদি তাহাই হও, তবে সেই ধর্ম্মধারী মূর্ত্তি না
থলে প্রণাম করবো না । তুমি আর বার তোমার সেই শ্রীমূর্ত্তি
ধরে আমাদের মনোসাধ পূর্ণ কর !” তখন আর ভক্ত বৎসল
হরি কিসেরন ? ভক্তের নিকট শ্রীসীতারাম মূর্ত্তি ধর্তে বাধ্য
হলেন । এরাই আদর্শ ভক্ত । আদর্শ গুরুভক্তি দেখাবার
জন্যই ভক্ত অবতাররূপে এসেছিলেন ।

তারক গোস্বামী বল্লভো—

“যে ব্যাহারে ভক্তি করে, সে তার ঈশ্বর,

ভক্তিযোগে সেই তার স্বয়ং অরতার ।”

এ যুগে, তাহাই । যে ব্যাহারে ভক্তি করে, ভগবান বোধে
ভক্তি করে, সেইই তার নিকট সত্য অবতারণ, পূর্ণ ভগবান । তার
অনন্ত মূর্ত্তি ! যে যা ধরে প্রকাশিত হতে পারে ।

গুরু শিষ্যের দৈহিক মানসিক সর্বপ্রকারের অভাব
অনুবিধা দূর করে, তাকে প্রকৃত শাস্ত্রের
পথে নিয়ে যান। যে প্রকারেই হোক, তাকে
প্রকৃত পথে নিতেই হবে। প্রেম-ভালবাসাই গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ।
প্রেমের জয় চিরকালই। যদি একজন ভক্তও পথভ্রষ্ট হয়ে
যায়, তাতে ভক্তেরও যেমন অপরাধ, গুরুরও তা হতে কম নয়।
উভয়েরই সমান অপরাধ। শিষ্য ত বুনো পাখী! তার আবার
কি? সে রাখাক্ষ না বলে যে উপদেষ্টাই দায়ী।

গুরু মাতাপিতার যুগল প্রতিমূর্তি। তিনি শিষ্যের প্রকৃতি
ভাব, অবস্থা বুঝে—পুত্র কন্যা, ভ্রাতাভগ্নী বা বন্ধু বান্ধবের ন্যায়
ব্যবহার করবেন, বন্ধুত্ব ভাবটী জগতে সর্ববশ্রেষ্ঠ ভাব। শিষ্যে
যে অনায়াস কৰ্ম্ম করে সুখ পাচ্ছে, গুরু যদি ন্যায় ও সৎকৰ্ম্ম
দ্বারা তাকে তদপেক্ষা অধিক সুখ শাস্তি দিতে পারেন, দিয়ে তাকে
উন্নত কর্তে পারেন, তবেই তার কর্তব্য শেষ হবে। তিনি ভক্তের
জন্য জীবন উৎসর্গ কর্তে প্রস্তুত। ভক্তসুখে সুখী। ভক্ত ও
ভক্ত-মন্ত্র, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শাস্ত্রাশাস্ত্র, এমন কি সর্বপ্রকার বন্ধন হতে
মুক্ত হয়ে গুরুরূপ মহাসমুদ্রে ডুবে যাবে, তাঁতে ভগবৎ জ্ঞানে
লীন হয়ে যাবে। যে কূলে থাকে, সেইই জন্মের দোষগুণ
দেখতে পারে; কিন্তু যে মৎস্ত হয়ে তাতে ডুবে যায়, সে আর
কিছু দেখতে পারে না। গুরুর পবিত্রতার শ্রুতিক বৃত্তিতে গমন
হয়ে গেলে আর গুরুর গুণাগুণ বিচার থাকে না। গুরুময় হয়ে,
গুরু হয়ে যান।

গুরুর আদেশ পালন করা, তাকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখাই ভক্তের কর্তব্য । এতে তিনি যেথায় নিয়ে যান, সেথাই বৃন্দাবন মোক্ষধাম । গুরুকে তাঁর প্রকাশ বলে মেনে, সন্মান করো ! একটু জ্ঞান হলেই দেখবে—গুরুও যা, তুমিও তা, পরব্রহ্ম ভগবানও তা । সব এক, কোনও প্রভেদ নাই, অভেদ ।

গুরুর সহিত মিশ্তে পাল্লেনি ভক্তের জীবন সার্থক । আবার একজন ভক্তের সঙ্গে ও গুরু মিশ্তে পাল্লেনি তাঁর জীবন ও সার্থক । জল-বায়ু অগ্নির যে কোন একটুর যে কোন অংশের এক পাশ্চ স্পর্শ কলে, জান্লে যেমন উহার সমস্তই স্পর্শ ও জানা হয়ে যায়, তদ্রূপ সেই এক ব্রহ্মেরই অনন্ত মূর্তির যে কোন এক মূর্তির স্বরূপে আপন স্বরূপ জেনে মিশে যাওয়া । এক হয়ে যাওয়াই সমস্তের সঙ্গে, পূর্ণের সঙ্গে মিশে যাওয়া । বস্তুতঃ গুরু শিষ্যকে পবিত্র করে, আপনার সঙ্গে এক করে নেন, আর ভক্ত ও নিজের মধ্যেই গুরুর পবিত্র মূর্তি, পবিত্রভাব প্রবিষ্ট করে এক হয়ে সেই অনন্ত একের সঙ্গে মিশে যায় । ইহাই গুরু ভক্তের কর্তব্য ।

সাধনা ও সাধনার সৎ কর্ম করাই সাধনা । গুরুর আদেশ গুরুর প্রিয়োক্ত । পালনই সাধনা । এতেই সাধ পূর্ণ হয় । সাধ-না, সাধ, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা না থাকা, নিবৃত্তিই সাধনা । সর্ব বিষয় হতে মনের সাধ বা প্রবৃত্তি চলে গিয়ে আত্মায় আত্মস্থ হবে, এইই সাধনা, এইই সকল ধর্মের, সকল জীবের উদ্দেশ্য । পুনঃ স্বভাবে ফিরে যেতেই সকলের আকাঙ্ক্ষা ।

উহাতেই সকলের শান্তি, উহাই সকলের স্বভাব, স্বভাব প্রাপ্তিই সাধনার সিদ্ধি ।

গুরুর সাধ্ নাই, কাম নাই, নিত্য সমাধিস্থত্ব । তাই তার নিকটই সাধ্ কাম হীন-নির্ব্বাণ রাজ্যে যাবার কৌশল জানতে হবে, তার সঙ্গে চলে যেতে হবে । যে, যে রাজ্যে পৌঁছেছে, সেই সে রাজ্যের প্রকৃত পথের সন্ধান জেনেছে । কেবল তার নিকট হতেই সে পথের প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যাবে ।

মন্দিরে যাবে, এগোতে থাকে । প্রথম প্রথমই পাণ্ডা খুঁজো না । কত বগুগুগু পথে ঘুরছে—পথিকের পকেট কাটতে । কার হাতে পড়ে যাবে । মূলধন খোঁয়াবে ! শেষে আর আসল পাণ্ডাকে ও বিশ্বাস কর্তে পারবে না, মন্দিরেও যাওয়া হবে না । এগোতে থাক, এগোতে থাক, এগোতে এগোতে যখন মন্দিরের দরজায় ঠেকবে, তখনই আসল পাণ্ডা টেনে তুলবে । তাই সময় হলে গুরু আপনি এসে জুটবেন, আর তাকে দেখেই চিনতে পাবে । তাঁকে খুঁজে নিতে হবে না । আপন আপন বুদ্ধি মন্তানুসারে যতদূর পার চলতে থাকে । চিন্তা কি ? স্বাবলম্বীর উদ্দেশ্য কখনো ব্যর্থ হয় না । স্বাধীনতাই যে ভগবানের স্বরূপ ।

সাধনার অধিকারী যাকে তাকে বীজ দিতে নাট । উপযুক্ত কে ? সাধনার প্রকার । ক্ষেত্রে বীজ ছড়াতে হয় । যে সত্যবাদী জিতেশ্বর বিশ্বাসী, অনুগত, বলবান, যার হৃদয়ে স্বাধীনতার হাওয়া লেগেছে, বন্ধে যার প্রাণ ধড়্‌ধড় করে উঠেছে, সেইই সাধনার অধিকারী ।

যার বিষয়ে বিরক্তি এসেছে, যে উদাসীন, অথচ কৰ্ম্মবীর, গুরু তাকেই আত্মজ্ঞান প্রদান করেন । মহাভাব তাঁরই প্রাপ্য ।

সাধন, ভজন, কীর্তন, অর্চন, যে বাইই বলুক, বাই, করুক, সকলেরই উদ্দেশ্য তাঁর নিকট পৌঁছান । এসবগুলোই তাঁর নিকট পৌঁছাবার পথ মাত্র । আরো কত পথ আছে । তাঁর রাজ্যে পৌঁছাবার এক পথ, আবার এক একজনের এক এক পথ । রাজধানীতে পৌঁছাতে হলে যেমন যার যার গ্রামের পথ দিয়ে চলে শেষে এক রাজপথেই সকলকে উঠতে হয় । তদ্রূপ প্রথম এমত, সেমত, এধর্ম্ম সেধর্ম্ম শেষে যখন এগিয়ে গিয়ে প্রশস্ত উদার একপথে উঠবে, তখন দেখবে বিভিন্ন মোটেই না । সকলেই একপথে একই উদ্দেশ্যে যাচ্ছে ।

জ্ঞানীরা জ্ঞানের সাধন কচ্ছে । তারা জ্ঞান দ্বারা দেখছে ব্রহ্মায়ম্ এ ব্রহ্মাণ্ড । সেই এক সত্ত্বা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে রুয়েছেন । তাকে ডাকার প্রয়োজন কি ? পৃথক করার প্রয়োজন কি ? তিনিই যে আমি, আমিই যে তিনি—তত্ত্বমসি ! ওম্ ! এইরূপ ভাবনা করে তারা তাঁতে মিশছে ।

কৰ্ম্মারা কৰ্ম্মের সাধন কচ্ছে । তারা প্রতিমূর্তিতে তাঁর সত্ত্বা জেনে তাঁর সেবা কচ্ছে । এইরূপে সেবা করে করে তাঁর সর্ব্বরূপে আপন অস্তিত্ব বিলিয়ে দিয়ে সেই অনন্ত সত্ত্বায়ই মিশে যাচ্ছে ।

যোগীরা যোগস্থ হয়ে আছে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে তাতে সমাহিত হয়ে আছে । য়ানস্থ হয়ে আছে । তাঁকে ভাবতে

ভেদে, তাঁর চিন্তা, তাঁর ধ্যান কন্তে কন্তেই তাঁতে সমাধিস্থ হয়ে
যাচ্ছে ।' ডখন তুমি আমি প্রভৃতি দ্বৈত জ্ঞান দূরে গেছে ।
সহস্রারে তাঁর পূর্ণ জ্যোতিঃতে তন্ময় হয়ে মিশে যাচ্ছে । -

আবার ভক্তেরা আপন আপন উপাস্যের মধ্যে তাঁর পূর্ণ
প্রকাশ জেনে, তাঁর পূজা, ধ্যান, তাঁর সেবা করে করেই তাঁর
সহিত আপন সত্ত্বা মিশিয়ে দিয়ে সেই একই পরমানন্দে মিশে
যাচ্ছে । কিন্তু যে যে পথ, যে ভাব নিয়েই চলুক, সেই একত্বের
দিকেই চলছে । তাঁর অনন্ত মূর্তি, অনন্ত নাম, অনন্ত ভাব । যে
যে নামে, যে মূর্তিতে যে মিশে সেই অনন্ত মহানে আপন আপন
একত্বে মিশতে পারে মিশুক, বাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন কি? ভিন্ন
ত কেউ নয় ! অপর ত কিছু নয়, সবই যে এক । সব মতই যে,
তোমার, সব ভাবই যে তোমার । তুমি কোনটা নিন্দা আর
কোনটা বন্দনা করবে ? পাগলামী কেন হে ? আমি পাগল
নই ! তোমরাই যে সব পাগল । যখন আমার মত পাগল হবে,
বুঝবে কে পাগল ! হরিবল্ হরিবল্ !

যে, যে পথ ধরেছ,
যে, যে পথ ধরেছ, ঠিক ধরে থাক ।
যে, যে পথ ধরেছ, ঠিক ধরে থাক । অন্যের
পথ ভ্রষ্ট হলে মহাবিপদ । পথে অনেক ছদ্ম-
পথে বাধা দিওনা ।

বেশী দন্দ্য-ডাকাত সাধু সঙ্গে পথ ভুলিয়ে
নিয়, শেষে সর্বনাশ করে থাকে । সাবধান ! লোভে পড়ো না,
ভুলে ভুলে যেয়ো না । যে পথে চলেছ, একদম চলতে
থাক । কান্দে হয়ো না । একদিন ঠিক স্থানে পৌঁছাবেই ।

তুমি শান্ত, তোমার ভাব অন্তের সম্পূর্ণ উন্মোচন । তাই অন্তে

তোমার নিন্দা কল্পে ওঁ ভ্যাগ কর্বে না । বা তাঁদের মন্ত্ৰে
ও নিন্দা কর্বে না । তুমি যে তার পথ জান না, আরার, সেও ত-
তোমার পথ জানে না । তা পরস্পর বোকার মত বিবাদ করে
মর্বে কেন ? তুমি তোমার ভাবে চলে যাও । অন্তের সমা-
লোচনায় কান দিওনা, বা অন্তের ভাবের সমালোচনাও করে
না । আর, তুমি বৈষ্ণব, কি বৌদ্ধ, কি মোস্লেম খৃষ্টান, তুমি
ও তোমার ভাবে তোমার কর্তব্য করে যাও । তার নিয়মের
একটু ও এদিক ওদিক যেয়ো না । যার যেটা ভাল লাগে, সে
সেইটা : করুক । এইটুকু মাত্র ঠিক জান্বে যে—যে পূজোর যে
মন্ত্ৰ, তার খাঁটি উচ্চারণ চাই । একটু ও বাদ দিলে চল্বে না ।
সিদ্ধ হ'বে না ।

যে যেভাবে চলেছে, তাতে ও বাধা দিবে না ; বরং তাকে
তার ভাবে চলতে আরো সাহায্য কর্বে, তবেই ধর্ম হবে ।
পরস্পরকে তাঁর নিকট যেতে সাহায্য করাই যে মানবধর্ম ।
প্রত্যেক মানুষেরই ধর্ম বা ভাব যে স্বতন্ত্র । মনেরই সব কর্ম
কি না ? প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র মন, কারু সঙ্গে কারুই খাপ খায়
না । ভাব, বা মত ও তরুণ পৃথক পৃথক । যদি একটু গভীর
চিন্তা করে দেখো, তবেই সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী দূর হয়ে যায় ।
সম্প্রদায় কি ? সকলে অন্ততঃ ১০১২ জন হতে ২০ কোটি
লোকের তাঁকে একনামে ডাকা, মাত্র । , কিন্তু প্রত্যেকেরই মন,
স্বতন্ত্র হেতু ভাব ও স্বতন্ত্র । তাঁর বখনিই মনের, ধর্মের, সর্ব-
প্রকারের বয়নের হাত হতে মুক্ত হবে; আত্মস্থ হ'বে; সমাধি বা

ভূতে লীন হবে, তখন দেখবে এসব কোথায় চলে যাবে ।
দেখবে সব এক । সেই এক শক্তিময়েরই খেলা ।

অসম্ভব কিছুই নয় ।
দৈব ও পুরুষকার বলে
সবই সম্পন্ন হয় ।

যোগ, ধ্যান, ঈশ্বর আরাধনা, প্রভৃতি
অনেক বড় বড় কথা শুনে অনেকে ভেবে

বসো যে ওঃ, ওসব কি আর আমরা কত্তে পারি ? ও কি মানুষের
সাধ্য ? ও সব পারে মুনি ঋষিরা, সন্ন্যাসীরা । ও কি আবার
অগ্নি যেথা সেথা থেকে করা যায় ? কত্তে হয় শ্বাস, কুস্তক,
যোগ আসন করে, পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে, নয়ত কোন ফল ফলে
না । কিন্তু তা নয় । রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামপ্রসাদ, কবীর,
নানক, গোলোক, হীরামন এরা কি শ্বাস-কুস্তক করে, পাহাড়
পর্বতে গিয়ে সিদ্ধ হয়ে ছিলেন ? এরা কি একেবারে পৃথগাগী
হয়ে ছিলেন ? ঘরে, বনে, পাহাড়ে পর্বতে সব জায়গায় তাঁর
আরাধনা চলে । কিন্তু কথা এই—এমন সব জায়গায় তাঁর
উপাসনা কত্তে হয়, যেখানে মন পবিত্র ও শান্ত থাকে, মনের
প্রশান্তি বিন্দুমাত্রও ব্যাভ্যাস না হয়, স্বাস্থ্য ভাল থাকে । একুপ
স্থানই সাধনার প্রশস্ত স্থান ! আসল কাজ মন শুদ্ধ করে তাঁতে
বসান । শেষে মন একবার স্থির হয়ে গেলে, পবিত্র হয়ে গেলে
সব জায়গায় সকল অবস্থায়ই তাকে ডাকা চলে । সর্বরূপই
যখন তাঁর, তখন আর ভাল মন্দ কি ? তাঁতে ডুবেই, মিশেই
তাঁই ধরন হয়ে আছি তখন আর কি ? এইটে ভাবাই সাধনা ।

দৈব ও পুরুষকার বলে সব কিছুই সম্পন্ন হয় । এক হস্তে
উপাস্ত গুরু দৈব-শক্তি, আর হস্তে নিজস্ব আত্ম-শক্তির প্রকাশ

তারাই বীর সাধক সত্বর সেই অনন্ত মহানের সাক্ষাৎ লাভ করুক ।
 সর্বদা দৃঢ়ভাবে ভাববে—“আমার মধ্যে সব আছে, আমি পারি না
 ত কে পারবে ? আমি সর্ববশক্তিমান, সেই অনন্ত মহাশক্তির
 সম্ভান । তাঁর সহিত অভিন্ন ।” এইভাবে যে অতি তেজের
 সহিত বীরের মত সাধনা করে, সেইই তাকে শীঘ্র পেয়ে থাকে ।
 নতুবা ভ্রাতাভাচ্যাকার মত হয়ে, আমি কিছু না, আমি কিছু না,
 আমি পাপীতাপী, দাস, অধম, তুমিই সব, তুমিই সব ভাবে সাধন
 কলে কোন জন্মেও কিছু হবে না । ঐ দীন হীন, পাপীতাপী,
 দাস ভাবের সাধনা কতে কতে ক্রমেই ঐরূপ হতভাগা হয়ে যাবে,
 দুর্বল হয়ে যাবে । দুর্বলের কোন দিন ভগবান লাভ হয় না ।
 দুর্বলের ভগবান নাই । আছে শুধু তার ফাঁকা নাম মাত্র ।
 সবলেরই ভগবান । ভগবান অর্থে ই ষড়ৈশ্বর্যশালী পুরুষ প্রবর ।
 তিনি অনন্ত বল, অনন্ত বলের আধার । বলবান নির্ভীকই তাকে
 পাওয়ার উপযুক্ত । তাঁর প্রকৃত ভক্ত । তারাই তাঁকে এ
 যাবৎ পেয়ে আসছে । ক্ষাত্রশক্তি—কৃত্রিয় না হয়ে ব্রাহ্মণ হওয়া
 যায় না। তাঁকে পাওয়া যায় না। ক্ষাত্রশক্তির অবহেলা করেই
 এই দেশের ভারত এখন কান্ডাল হয়েছরে । এরা শুধু ফাঁকি
 বাজী দিয়ে, রজোগুণকে তুচ্ছ করে, একলাফে সঙ্গে ধেয়ে পড়-
 বার চেষ্টায়ই গভীর গহবরে গিয়ে পড়েছে । আগে রাজা হও, বীর
 হও, শেষে সৎ সাধু হয়ো । ‘সর্বদা কন্দ করবে, আর ধ্যান করবে,’
 জপ করবে—“আমিই সেই অনন্ত মহাশক্তি, অনন্ত সত্ত্বা, নিত্য
 মুক্ত চৈতন্যব্রহ্ম ।” এই ভেবে কাজে লেগে যাও, সব হয়ে যাবে ।

/ বিশ্বাস ।

যতকিছু দেখো বিশ্বাসই কিন্তু সকলের মূলে । তুমি যদি বিশ্বাস কর ত জগৎ আছে, ঈশ্বর আছে ; তবে আছে । আর যদি মনে কর কিছুই নাই, তবে তোমার নিকট কিছুই নাই । কারণ যুমিয়ে পড়লেই যখন কিছু আছে বলেই বোধ হয় না, কিছুর বোধ থাকে না ; আবার চোক মেলেই কিছু আছে বলে অনুভূত হয় । তখন ইহা কল্পনা বৈ আর কি ? যদি তুমি আমাকে সৎ বলে মনে কর ভ, আমি তোমার নিকট সৎ, আর অসৎ যদি মনে কর ত অসৎ না হয়ে যাই কোথা ? এই বিশ্বাসের উপরই জগৎটা ভাসছে ।

মৃগায় দেব প্রতিমায় তুমি সাক্ষাৎ দেবতা প্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস ভক্তি কচ্ছ বলেই তোমার নিকট উগা জাগ্রত, সাক্ষাৎ চৈতন্যস্বরূপ । কিন্তু একজন খৃষ্টান কি মুসলমান উহা দেখে হাসছে আর বলছে—“লোকটা বাতুল, পুতুল পূজো, কচ্ছে ।” ভাবছে “ওর মধ্যে ঈশ্বর আছে । ঈশ্বর ত আর জায়গা পায় না ? তাই খড় বাঁশ আর মাটির বোন্দায় তৈরী পুতুলের মধ্যে শেষকাণ্ডে ঢুকছে ।” উহাতে অবিশ্বাসীর এই বিশ্বাস । আর বিশ্বাসীর নিকট প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, সাক্ষাৎ চৈতন্য স্বরূপ দেবতা ।

গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর্তে হয় । গুরু নররূপে নারায়ণ, সাক্ষাৎ ভগবান্ । বিশ্বাস না কলে জগতে কোন কিছুই জানা যায় না, করা যায় না, পাওয়া যায় না, জগতের অস্তিত্বই ক থাকে না । হাজার জন্মে ও বিশ্বাস না হলে কার কিছুই হবে না । স্কুলের ছাত্রের যদি ‘ক’ এ আকার দিলে ‘কা’ হয় ইহা বিশ্বাস না

করে, তার আর কি শিক্ষা হয় । বিশ্বাস বিনা কিছুই হয় না ।
 দুনিয়াটাই এই বিশ্বাসের মূলে চলছে । বিশ্বাস ছাই । বিশ্বাসে
 মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর । প্রথম সংকথা শ্রবণ কর্তে হয়, শেষে
 মনে মনে চিন্তা করে বিচার কতে হয়, দর্শন কতে হয়, অবশেষে
 পরীক্ষা করে খাঁটি হলে তবে বিশ্বাস করে নিতে হয় । তাহলে
 আর উহার নড়চড় হয় না । যা একবার পরীক্ষা করে ধরেবে,
 তা আর জীবনে ছাড়বে না । কিন্তু বিনা পরীক্ষায় অন্ধের মত
 যা তা বিশ্বাস কলে বোকা বলে ঠেকে যাবে । তবে জানবে-সব
 বস্তুর মূলে গুরু চাই গুরুব্যাক্যে বিশ্বাস চাই । গুরুই সব । গুরু
 পূজাই তাঁর প্রত্যক্ষ পূজা ।

“ধ্যান মূলং গুরোর্মূর্তিঃ, পূজা মূলং গুরোপদং,

মন্ত্র মূলং গুরোবাক্যং, মোক্ষ মূলং গুরো কৃপা ।”

ধ্যান কর্বে শ্রীগুরু মূর্তি, পূজা কর্বে শ্রীগুরুপদ, মন্ত্র বলে গ্রহণ
 কর্বে শ্রীগুরুর মুখ নিহিত প্রতিবাক্য, আর এতেই শ্রীগুরু সদয়
 হলে, তাঁর কৃপায়ই মোক্ষ লাভ হবে ।

নাম ও ধ্যান ।

শব্দ শক্তি—নাম
ত্রক ।

সেই কোন্ আদি যুগ হতে আৰ্য্য ঋষি-
গণ প্রাতঃশয্যা ত্যাগ করে প্রার্থনা করে
আসছেন—“হে প্রভু! আমরা যেন কর্ণধারা সর্বদা ভদ্র ও পবিত্র
শব্দ সমূহ শ্রবণ করি, চক্ষুদ্বারা যেন ভদ্র ও পবিত্র বস্তু সমূহ
দর্শন করি, এবং আমাদের মুখ হতে ও যেন সর্বদা ভদ্র ও পবিত্র
বাক্য সমূহ বের হয়, আমরা যেন পবিত্র ও ভদ্র হই।” শব্দের
অদ্ভুত শক্তি । তাই দেবগণও ভদ্রশব্দ শ্রবণ ও কখন কর্ণধার
জন্ত তাঁর নিকট প্রার্থনা কতেন । এই আমরা নানা জনে নানা
বিষয়ের আলোচনা করছি, যাই একটা বাজ পড়ার শব্দ হোল,
আর অমনি যার মন যেখানে ছিল, একসঙ্গে ছুটে গিয়ে পড়ল
ঐ বাজের গুড়ুম-গুন্ম শব্দে । অদূরে ঐ একজন বাঁশী ফুকারলে
“আর সব কাজে শিথিলতা এসে কান গেল—মন গেল ঐ বাঁশীর
তানে । এইই হোল শব্দের মনকে একোভূত কর্ণধার—জাগ্রত
কর্ণধার শক্তি । একাগ্রতা বা চিন্তাবৃত্তি নিরোধরূপ যোগস্থ কর্ণধার
শক্তি । আবার বল্লম তুমি উঠে যাও, অগ্নি উঠে গেলে ।
বল্লম পায় আন, আন্লে । যদি বলি তুমি আমার প্রিয়, তোমার
মতন আর আমার কেউ নয়, শুনে খুব সুখী হলে । আল্লাহ যদি
বলি—দূর শালা, তুই বড় বেয়াদব, বেদমাস, পাঁজি, অমনি বড়
হুঃখিত ও অন্তর্ধান হলে । আর আমার মনে ও জালমন্দ কথার

সাথে ভালমন্দর বিকৃতি এসে গেল । এ কি ? শব্দশক্তির খেলা । যখন শালা বল্লম তখন তোমারও মনে অপবিত্র অসন্তোষের জঁক, আসল, আমার মনে ও আসল । আর যখন বন্ধু মল্লম তখন তোমারও সন্তোষ ও পবিত্রতার ভাব আসল, আমারও তাই আসল । আমার নিকট এগিয়ে দাঁড়ালে, আমিও তোমার নিকট এগিয়ে গেলাম । এইরূপে মিশ্তে মিশ্তেই সেই একত্বে মিশে যায় । 'এতদূর শব্দের শক্তি । এই জগুই শব্দকে শব্দব্রহ্ম নাদ-ব্রহ্ম বা নাম ব্রহ্ম বলে । তাই নাম ব্রহ্মের উপাসনা সারা জগৎ ভরে চলছে । আর ভারতে উহার এতদূর উৎকর্ষতা হয়েছিল যে, এখনো শব্দ বা সরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর কল্পনা ও তার পূজা ঘরে ঘরে হচ্ছে ।

মুখে যেই যা আওড়াক, জগতে নিরাকার বাদী কি বিশুদ্ধ অদ্বৈত ভাবাপন্ন লোক কোটির মধ্যে ও একজন খুঁজে পাওয়া যায় না । সবই সাকারবাদী । যে নিরাকারবাদী কি অদ্বৈত-বাদী সে কোন কথা বলতে বা কার্য্য করতেই পারে না । সমাধিধানি ভিন্ন কেহ অদ্বৈতবাদী হতে পারে না । অদ্বৈতবাদীর ইন্দ্রিয়গণ থাকতে ওঁ অচল, কর্ম্ম শক্তি রহিত হয়ে যায় । কার্য্যই আর তখন থাকে না । তাই জগৎবাসী সাকারবাদী । আকার যুক্ত জীব কেমন করে নিরাকারের ধারণা করবে ? সাকারের আরাধনা করে করে ধাপে ধাপে উপরে উঠে শেষে নিরাকারে পৌঁছাতে হয় । পৃথিবীর সমস্ত বৈদিক জাতি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ভাবে প্রতীক বা প্রতীমায়ই পূজা উপাসনা করেছে ।

মোসলমান 'কি কৃষ্ণানেরা মুখে নিরাকার ফিরাকার উচ্চারণ করেন ও, বেদশাস্ত্র মুখে অস্বীকার করে ও তারা যথার্থ ভাবে শব্দ প্রতীকের উপাসনা কচ্ছে, বেদের নিয়মই মেনে চলছে। মুসলমানে “আল্লাহ” এই মহান পবিত্র শব্দে তাঁর মহান সত্তা অনুভব কচ্ছে এবং মকায় যে তাঁর প্রকাশ হয়ে ছিল, তা জেনে ঐ দিকেই প্রণাম করে থাকে। আর কৃষ্ণানে ও “পরম পিতা” ও বিভিন্ন দেবদেবীর ফটোর পূজা কচ্ছে। বৈদান্তিকেরা নাম ব্রহ্ম বা শব্দ প্রতীকের সাধনা কচ্ছে। ও, হরি, ব্রহ্ম, শিব, সত্য, বন্ধু প্রভৃতি বহুবিধ শব্দ প্রতীক তাদের রয়েছে। এই সব প্রতীকে পবিত্রতা, জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেম এনে দিয়ে পরিশেষে সমাধি মন্দিরে নিয়ে যায়। এই সব শব্দেই সকলে ব্রহ্ম উপলব্ধি কচ্ছে। ব্রহ্মানন্দ পাচ্ছে, ইহাই ব্রহ্ম। এই নাম ব্রহ্মের সাধনায় এ দেশে অপূর্ব আনন্দ স্রোতঃ বয়ে গেছে। তাই ভক্ত গায়—“যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজনিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছে তাপনি শ্রীহার।”

সমস্ত ধর্ম্মেই নাম কীর্তনের স্থান অতি উচ্চে। এই কীর্তনে স্বাধীনতা এনে দেয়, নিদ্রিত কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করে দেয়, পবিত্রতা, জ্ঞান-ভক্তি প্রেম-মুক্তি এনে দেয়। ঐযোগীরা এই নাদ যোগেই যোগস্থ হয়ে সহস্রারে সেই ব্রহ্ম জ্যোতিঃ দর্শন করে তাঁতে সমাধিস্থ হয়ে যায়।

ওঠা নামার একই পথ। যে পথে ওঠা যায়, সে পথে নামা ও যায়। যেখানে ভাল, মন্দ ও লেইখানে। একই পত্রের

নীচের আর উপরের পিঠমাত্র। মন্দ ত্যাগ কতে হলে ভাল ও ত্যাগ কতে হবে। তবে আগে ভাল ধরে মন্দ ত্যাগ কতে, শেষে ভাল মন্দ দুইই ত্যাগ কতে হয়। যা'ক, যে সকল শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে পবিত্র হওয়া যায়, উহা দ্বারা যেমন জীবের মঙ্গল সাধন হচ্ছে; তেমন আবার কতকগুলো শব্দ আছে, যা পূর্বে আর্য্যগণের সংস্কৃত ভাষায় স্থান পায় নাই, এমন ঘৃণিত, অকথা, অন্যের মন্যভেদী শব্দ সকল দ্বারা ও সর্বদা সর্ব দেশের বড় অমঙ্গল সাধন হচ্ছে। তাই সর্বদা পবিত্র, সৎ ও ভদ্র বাক্য উচ্চারণ করবে। উহার প্রভাবে শীঘ্রই তোমাকে সৎ ও পবিত্র করে তুলবে। তদ্রূপ অশ্লীল, অসৎ বাক্য ও কখনো বলবে না, শ্রবণ করবে না। উহার প্রভাবে নেমে পড়বে। সর্বদা মনে মনে, উচ্চৈঃস্বরে, জোরে বলবে মহাশক্তি মহাপ্রেম, পবিত্রতা, আনন্দ, নিত্য, সত্য চৈতন্য, ভেজঃবীৰ্য্য, ব্রহ্ম-বন্ধু, তত্ত্বমসি, ওম্ হ্রীম্। সব দৈন্ত-জাড্য-দাস্য, ভাব দূর হয়ে যাবে, ব্রহ্মভাব উদ্দীপিত হবে।

নাম স্মরণ অবস্থায়
কি প্রকারে নিতে
হয়।

নাম নেওয়া কি, সোজা? প্রভু গৌরাঙ্গদেব
নাম নেওয়ার সুন্দর ও সহজ ফন্দি বের করে

দিয়েছেন :—

“তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিসুনা,

অমানিনা মান দেন্ড, কর্তনীয়ঃ সদা হরি।”

তৃণ হতেও নীচ, তরুর মত সহিসু, গোড়ায়, কুড়ুল মারলেও ছায়া দেবে, মাথায় ঢিল ছুড়লেও ফল দেবে; অর্থাৎ অপকার

ঐশ্বিনীনবন্ধু বাণী মহাশয় ।

করলে ও উপকার করবে, নতুগুণী হয়ে আপন বলে প্রেম করবে ।
 কারি নিজে সম্পূর্ণ মান অহঙ্কার ত্যাগ করে অন্যকে মান দেবে,
 এইরূপে পবিত্র ও সংযত হয়ে সদা নাম কীর্তন করবে । তবে
 প্রেম হবে । ' হ্যারে, নাম যে মহাশক্তি । কলিতে নাম ভিন্ন
 অন্য গতি নাই । "হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্,
 কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।"

আর গতি নাই । সর্বদা জোরে, উচ্চস্বরে বলবে,—যেন সকলে
 শুনে ও পবিত্র হয়ে যায়,—“জয় হরিবল, গৌরহরি বল. হরি
 হরি বল ।” সব পাপ তাপ দূর হয়ে যাবে । এ পবিত্র নাম
 সর্বদা সকল সময় নেবে । কে বলছে নাম নিতে হবে মালা
 তিলক ফোটা কেটে ? টুপ্ টাপ্ চূপ্ চাপ্ করে ?—সর্বদা নেবে ।
 ঘাটে মাঠে, মঠে মন্দিরে, হাটে বসতে, খেতে শুতে, শৌচে-
 পর্যন্ত নেবে । দেখো না, ঐ রুদ্রস্বামী বাহে-প্রস্রাব করতে,
 এমন কি নিদ্রায়ও নাম জপ্ছে । যা পবিত্র, তা সর্ব সময়
 সর্ব অবস্থায় পবিত্র । তাঁর নামে আবার অপবিত্র করে ?
 সব পবিত্র । সর্ব নিম্মল । জ্যোতির্স্বয় । যখন কাম ক্রোধ
 কি কোন অন্যায় ভাব মনে জেগে উঠে, তখন বোলো দিকি জোরে
 “জয় হরিবল্ ।” দেখ্বে কোথায় সব পালিয়ে যাবে ! যদি
 তাতেও ইতস্ততঃ ভাব আসে, আমি বলছি-বোলো—“জয়
 দীনবন্ধু, জয় দীনবন্ধু জয় দীনবন্ধু” শমন পর্যন্ত হটে যাবে,
 কাম ক্রোধ কোন ছাব ? একবার নাম নিলে সব পাপ হবে,
 জীবের কি সাধ্য আছে, তত পাপ করে ? তবে লওয়ার মত

লগ্নেই চাই। ডাকার মত এক ডাক দিলেই তিনি সাপ্লাং হন।
হরি বলে তাঁতে একেবারে বাঁপ দিয়ে পড়বে, হরি হয়ে, তলিয়ে
হয়ে যাবে। তখন আর অন্যবার বলবার শক্তি থাকবে না,
দরকার শু হবে না। সে তন্ময় কেমন :—

“যাহা, যাহা নেত্রে পড়ে, তাহা কৃষ্ণ ময়।

নিজে কৃষ্ণ হয়ে কৃষ্ণ সাগরে ভাসয়।” ইহাই

সমাধি ইহাই সিদ্ধি।

কিন্তু তা বলে নামকে যেন আবার একেবারে সর্ব্বসর্ব্বা
নামের সহিত ধ্যান ভেবে বসে না। নাম যেন কাগচি লেবুর
বা যোগ ও সমাধির রস। যখন অরুচি জন্মে, তখন একটু খেয়ে
নিলেই হোল। রোগীকে প্রথম ভাত দিতে হলে যেমন
কাগচির রস দিয়ে না দিলে মুখে রোচায় না; আবার গুর
এমনই গুণ যে, সব সময়, সবতায় দিয়ে খেলে ও উহার আশ্বাদ
বৃদ্ধি করে। নাম ও তজ্জন, ত্রক্ষে তন্ময় বা ধ্যানস্থ হবার বিশেষ
সহায়ক মাত্র। আগার ধ্যান ঠিক হয়ে গেলে, পূর্ণ একাগ্রতা
এসে গেলেও ত্রক্ষ রস আশ্বাদনের জন্য উহা সময় সময় নিতে
হয়। তে নিজেও শাস্তি লাভ হয়, অন্তরও শুনে প্রাণে
তৃপ্তি আসে। মুখে নাম নিতে হয়, অবশ্য যার যে নাম মধুর,
প্রিয় ও পবিত্র বলে মনে হয়, সে সেই নামই নেবে। আর
অন্তরে তাঁর রূপ ধ্যান কর্বে, দর্শন কর্বে। এইরূপ কন্তে
কন্তে যখন পূর্ণ ধ্যান বা ভ্যাক/সমাধি হবে, তখন আর নামের

কথা দেখবে মনেই থাকবে না। মুখে শুধু-“ওম্” “ওম্” শব্দ
 দ্বারা থাকবে, কিন্তু বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে যাবে, দিব্যজ্ঞানের উদয়
 হবে। ঐরূপে যখন বিশ্ব ছেয়ে যাবে, তখন চক্ষু নানারূপের
 ‘মধ্য’ দিয়া একরূপই দেখবে, কর্ণ নানা বোলের মধ্য দিয়া ঐ
 এক “ওম্” বোলই শুনবে, রসনা ঐ এক বোলেই শাস্ত হয়ে
 যাবে। স্পর্শেন্দ্রিয়ে তখন এক অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই স্পর্শ হচ্ছে
 অনুভূতি আসবে। আত্মা পরমাত্মায় মিশে যাবে। এই
 অবস্থাই ইহাই কীর্তনের চরমোদ্দেশ্য, চরমোৎকর্ষভাব। আর
 এইরূপে ধ্যানে তাঁতে যোগ ভাবই, তাঁতে একেবারে “তাহা”
 হয়ে যাওয়াই সমাধা বা সমাধি। এসব বলা কহার বিষয় নয়
 গো! উপলব্ধির বস্তু। আজুল কাটলে কেমন বেদনা, তা কি
 কেউ কাউকে বলে বোঝাতে পারে? যার কেটেছে সেইই জানে,
 অথবা যদি কেটে দিতে পারে, তবে বোঝাতে পারে, কেমন
 ছালা।



প্রেম-ভক্তি ।

বৈরাগ্য বড় মস্ত জিনিষ । বহু জন্মের তপস্কার ফলে
বৈরাগ্য । মানবের বৈরাগ্যের উদয় হয় । সমস্ত বিষয়
আশয়ে পূর্ণ মাত্রায় বিতৃষ্ণা জন্মে । বিবেকীর
তৃষ্ণা একমাত্র ভগবানে । মানুষের যতদিন মুক্তি না হয়, ততদিন
সে কোন না কোন একটা নিয়ে থাকতে চায়ই, থাকবেই ।
কেউ কেউ বিষয় বিষয়ে জর্জরিত হয়ে ও তাই নিয়ে ও রয়েছে ;
আবার কেউ বা, যে একটু বুদ্ধিমান, সে খুঁজছে,—এ ছাড়া অণ্ড
কিছুতে ও বিন্দুমাত্র ও নিত্যস্থখ আছে কি না ? “যন্ সাধন,
তন্ সিদ্ধি ।” হয় ত এই সময় নিজেই কোন ভক্ত সঙ্গে গিয়ে
পড়ল, বা কোন ভক্তই এসে দেখা দিলে । যেই ভক্ত-সেই
ভগবান । তার নিকট নিত্য স্থখের আভাষ পেয়ে সে অনিত্য
স্থখের বিদায় দিয়ে তার সঙ্গে নিলে, ক্রমেই শাস্তি পেতে লাগলে,
আর উঁই ছাড়লে না । একেই বলে বিরাগ । একেবারে সব
ত্যাগ করে, সবতায় বিরাগি হয়ে একে যে রাগ-অমুরাগ, তাহাই
বৈরাগ্য ।

সাধারণতঃ দুই প্রকারে জীবের বৈরাগ্যের উদয় হয় । এক
সংসারের ধাক্কা খেয়ে, আর ভক্ত সঙ্গে ভগবৎ বিষয়ে অপার
অনাবিষ্ট আনন্দ পেয়ে । তবে অবতারের, আবির্ভাব বা তাঁর
সান্নিধ্য-নিত্য মুক্ত-নিত্য মুক্ত মহাপুরুষদের ক্রিয় কথার । তারা

নিজের। মুক্ত থেকেই বন্ধদের মুক্তির জন্য বন্ধের মধ্যে যুদ্ধে
গেড়ায়। শুকদেব ত মুক্ত, প্রকাশ্য মুক্ত হয়েই জন্মে ছিলেন।

এই বৈরাগ্য আসলে পর তাঁতে-ভগবানে ক্রমে ক্রমে এমনকি
টান বাড়তে থাকে যে, তাঁকে না দেখে আর থাকা যায় না,
প্রাণ বাঁচে না। এইরূপে যখন প্রাণ যায় যায় এমন অবস্থা
হয়, তখনি তাঁর সাক্ষাৎ পায়। এইরূপ প্রাণ যায় যায় অবস্থাই
বৈরাগ্যের চরমাবস্থা, পূর্ণ ব্যাকুলতা, পূর্ণ টান।

এই সময় প্রভু ভক্তকে বহু বিপদ আপদ, লোভ প্রলোভনের
মধ্যে ফেলে-পরীক্ষা করে নেন। সহজে কি আর তাঁর দয়া হয়।
তা হলে ত সকলেই তাকে পেতে পার্জো। তবে যে ছাড়িয়া না
ছাড়ে আশ, তার হই দাসের দাস। যে বার বার বিফল হয়ে ও
আশা ছাড়ে না, প্রভু তারই দাসের দাস হয়ে থাকেন। আশা
ছেড়ে না, আশায় বুক বেধে কাজে লেগে যাও; একদিন
মনোসাধ পূর্ণ হবেই হবে। এখানে এসো, আসা ছেড়ে না,
আশা ও ছেড়ে না, একদিন সব জালা নির্বাপিত হবেই।
অনন্ত শান্তির অধিকারী একদিন হবেই।

তাঁর আকর্ষণ চুম্বকের মত। চুম্বক লোহাগুলি যে যেখানেই,
যতদূরেই থাকনা, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ টানাটানি আছেই।
যখন উহা প্রবল হয়ে উঠে, কাছাকাছি হয়, তখনি পরস্পর মিলে
যায়। জীব সকল ও ঐরূপ, প্রত্যেকেই 'ভগবানের অংশ',
বৈচিত্র্য, তাঁর হতেই এসেছে, তাঁতেই পুনঃ ফিরে যেতে সাধ-টান
আছেই। জীবাত্মায় পরমাাত্মায় সর্বাবতঃই টানাটানি আছে।

শ্রীশ্রীদীনবন্ধু বাণী মাহাত্ম্য ।

যখন উহা নিকটবর্তী হয় জীবাত্মার বন্ধ দুয়ার খুলে যায়, তখনই মিলন হয় । এই টানাটানির গাঢ় অবস্থাই ভাব-প্রেম ।

চাঁতে ভালবাসাই ভক্তি । কায়মনোবাক্যে সর্বপ্রকারে তাঁর প্রতি অনুরাগ হওয়াই ভক্তি । এই ভক্তি বা ভক্তি, ভাব ও প্রেম ।

ভালবাসা গাঢ় হলেই ভাব । ভাব হলে উপাস্ত ও উপাসক তফাৎ থাকে না । সর্বদা বন্ধুর মত মিলে, গলা-গলি হয়ে বিচরণ করে । আর এর পরে প্রেম । প্রেমে আর দ্বৈত নাই । অদ্বৈত । একেবারে সমস্তরূপে-তাঁতে মিশে যাওয়া, ভাব সমাধি হয়ে যাওয়া । বস্তুতঃ ভক্তি, ভাব, প্রেম, সমাধি একই বস্তু । কেবল উন্নতির স্তর স্তর হেতু বিভিন্ন নাম হয়েছে ।

ভক্তের কৃপায়ই ভক্তির সঞ্চার হ'য়ে থাকে । সাধুসঙ্গই কল্পে ভক্তির সঞ্চার ভক্তি লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ । যার যা হয় । আছে, তার কাছেই তা পাওয়া যায় । তোমার আমের দরকার হলে, কাঁঠাল গাছে উঠলে কি হবে ? তরুণ ভক্তি, ফুল পেতে হলে ভক্তের কাছেই যেতে হয় । “ভক্তিস্ত ভগবন্তুক্ত সঙ্গেন পরিজ্ঞায়তে ।” ভক্তি ভক্ত সঙ্গের জন্মে থাকে । ভক্ত ভগবানের প্রতিমূর্তি, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক । প্রথমে ভগবৎভক্ত সঙ্গ যোগে ভগবৎকথা শুনতে হয়, মনে মনে বিচার করে ধর্তে হয়, বিশ্বাস কর্তে হয়, শেষে কার্য্য কর্তে হয়, তবেই ভক্তিলাভ হয় । আর ভক্তি এলেই ভক্তের ভগবানও এসে উপস্থিত হন ।

একদিন বালক শ্রবণ মিতার অবজ্ঞায়, মিঁমাতার ভৎসনায়

‘ସ୍ତ୍ରୀତି’କୁଳିତି’କୋଳେ ଏସେ କେନ୍ଦେ ଛିଳ । ‘ସ୍ତ୍ରୀତି’ ସାଧୁ ସତୀ,
 ‘ସ୍ତ୍ରୀତି’ ରମଣୀ । ତାହି ତିନି ପୁତ୍ରକେ ପ୍ରାବୋଧ ଦିଲେନ—ବାବା,
 କିସେର ଛୁଃଖ ଏତେ ? ଯଦି ସେହି ସର୍ବନିୟନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦୁଃଖହର ହରି
 ନୟା କରେନ, ତବେ ଏ ଛୁଃଖ ଚଳେ ଯାବେ, ହରି ଯାକେ ବଢ଼ କରେନ, ସେହି
 ବଢ଼ ହୁଏ । ତିନି ଯଦି ତୋମାର’ପର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋତେନ, ଏ ଛୁଃଖ
 କେଟେ ଯେତେ ! ଶୁନେ ବାଳକ ବଲ୍ଲେ—“ମା, ତାକେ କୋଥାୟ ଗେଲେ
 ପାଓୟା ଯାୟ ? କି କଲେ ତିନି ଖୁସୀ ହୋନ ? ତିନି କୋଥାୟ
 ଥାକେନ ? ଆମାୟ ବଲେ ଦାଓ ମା, ଆମି ଏଥନି ପଣ କଞ୍ଚି—
 ସେରୁପେହି ହୋକ ତାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କର୍ବେବାଇ ।” ମା ଦୀର୍ଘନିଶ୍ଵାସ
 ଫେଲେ ବଲ୍ଲେ—“ବାପୁହେ, ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟେ ବସେ ଯୁଗ ଯୁଗ କଠୋର
 ସାଧନା କ’ରେ କତ ଗୁଣିଶାସିରା ତାକେ ପାଞ୍ଚେ ନା, ତୁହି ତାକେ ପାରି
 କେମନ କରେ ? ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷେର ବାଳକ ଶ୍ରବ ଏହିରୂପେ ମା’ର ନିକଟ
 ତାକେ ପାଓୟାର କିଞ୍ଚିତ୍ ସନ୍ତାନ ପେୟେ, ମାତାର ନିକଟ ହୁତେ ବହୁ
 କଞ୍ଚେ ବିଦାୟ ନିୟେ ରାଜ୍ୟାନ୍ତ୍ର ଲାଭାର୍ଥେ ଶ୍ରୀହରିକେ ପ୍ରସନ୍ନ କନ୍ତେ
 ଦେନେ ଟଳେ ଗେଲ । ବହୁଦିନ ତପସ୍ତାର ପର ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ
 ଏସେ ଦେଖା ଦିଲେନ ଏବଂ ମନୋମତ ବର ନିତେ ବଲ୍ଲେନ । ତখন ଶ୍ରବ
 ଏତଦୂର ସାଧନାୟ ଅଗ୍ରସର ହୁଏଛିଲ ସେ, ତାର କୋନ ସାଧୁ-କାମନାହିଁ
 ମନେ ଆସ୍ଲେ ନା । ବଲ୍ଲେ—“ହେ ପ୍ରଭୁ ! ତୋମାର ନିକଟ ଆର
 ଶ୍ଚି ବର ଚାବ ? ସକଳ ଚାଓୟା, ସକଳ ପାଓୟା ତୋମାକେହି ସଦନ
 ପେୟେଛି, ତখন ଆମାର ସବ ପାଓୟା ହୁଏ ଗେଲେ । ଯଦି ଇଚ୍ଛା
 ହୁଏ, ତବେ ଏହି ବର ଦାଓ ପ୍ରଭୁ—“ସେନ ତୋମାତେ ଆମାର ଅଚଳା
 ଶକ୍ତି ଥାକେ ।” ଦେଖେ, ପ୍ରଥମ ସର୍ବାମ ହୁଏ ସାଧନାୟ ନାମ୍ଲେ,

শেষে নিকাম ভক্তি পেলে, তাঁর দর্শন পেলে।—বাস্তবিক, তাঁর সাক্ষাৎ পেলে, তাঁর সাক্ষাতে তাকে ভিন্ন আর কিছুই কামনা-ভাবনা থাকেনা। এই দেখছ না, অনেকে এখানে সন্ধ্যা-নিয়ে আসে, এ নিব, তা নিব, এটা চাব, ওটা চাব, ইত্যাদি ভেবে। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত যারা, তারা যাই সাক্ষাৎ হয়, অমনি সব চাওয়া চাপা পড়ে যায়, পালায়ে যায়। আর চাইতে পারে না। ভাবে, প্রেমে, আনন্দে এতে এমন তন্ময় হয়ে যায় যে, বাহ্যজ্ঞান পর্যন্ত আর থাকে না।

আবার কতজনে দেখ, রাত্রি নাই, দিন নাই, সময় অসময় নাই, আসছেই,—কেউ রোগমুক্তির আশায়, কেউ মিথ্যা মোকদ্দমা হতে অব্যাহতির আশায়, অত্যাচার হতে রক্ষা পাবার আশায়, কেউ পুত্র-কন্যা ধন সম্পত্তির আশায়, নাম-বশঃ, প্রভাব প্রতিপত্তির আশায়, কিন্তু তোমাদের এই সাধুসঙ্গে পড়ে, সাধু বাক্য শ্রবণ করে, সাধু-দর্শন ও স্পর্শন করে, কত জনে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে, প্রেম-ভক্তি পাচ্ছে। ভক্ত-সঙ্গেই, সৎসঙ্গেই সব হয়। বিশ্বাসেই বস্তু মিলে।

ভক্তি অমূল্য ধন। কোন কিছুর সঙ্গেই ওর তুলনা হয় না।

ভক্তবীর কবীর গেয়েছেন—

ভক্তি অমূল্য ধন।

“অর্কবর্কব লো দব হৈ, উদয় অন্তলো নাজ।

ভক্তি মহাত্মা না তুলে, এসব কোনে কাজ ?”

অর্ক বর্ক স্পর্শান্ত ও, যদি তোমার ধনের পরিমাণ হয়, উদয়

স্বস্তি পর্য্যন্ত সমস্ত ধরণীর যদি তুমি একহস্তে রাখাও তও, কিন্তু তাতে কি হবে ? ভক্তির তুলনায় এসব কিছুই নয় ! ধূলি পরিমল ।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ, সেবায় সম্বন্ধে হয়ে কুন্তীকে বর নিতে বলেন । কুন্তীদেবী কিছুক্ষণ ভেবে বর চাইলেন—“হে কৃষ্ণ যদি সত্যই আমার প্রতি সম্বন্ধে হয়ে বর দিতে চান, তবে এই বর দাও যেন-সর্বক্ষণই আমার কোন না কোন বিপদ থাকে” । শ্রীকৃষ্ণ হেসে বলেন—“এত বর নয়, এবে অভিশাপ । ধন-জন সুখ-শান্তি, স্বর্গ প্রাপ্তি অথ বা চাও তাই দেবো ।” তখন আবার কুন্তীদেবী বলেন—“হে দয়াল কৃষ্ণ, যদি পুত্রগণ সহ সাম্রাজ্য নিয়ে সর্বদা সর্বস্থখে কাল কাটাই তা হলে সুখ পেয়ে ভুলে গিয়ে একবার আমরা দিনান্তে তোমার নাম নেবো না, স্মরণ কর্বে না ; কিন্তু যদি সর্বদা কোন না কোন বিপদের মধ্যে থাকি, তবে কোন ক্রমেই তোমাকে ভুলে থাকতে, না ডেকে থাকতে পার্বে না । তোমার প্রতি আমাদের ভক্তি অচলা হবে, আরও দিন দিন বর্দ্ধিত হবে ।” শ্রীকৃষ্ণ আর কি করেন ? “তথাস্তু” বলে ভক্তপদধূলি মস্তকে নিলেন ।

এই ভক্তি, এই প্রেম রজ্জুতেই মা যশোদা তাঁকে চিরদিন বেঁধে রেখেছে । ভক্তরাজ হনুমান্ হৃদয়ে পুরে রেখেছে । আর গোপীগণের কথা কি বলবো ! তাঁরা যে প্রেম-স্বরূপা হয়ে প্রেমে ডুবেই আছে । প্রেমে জন্ম, প্রেমে স্থিতি, প্রেমেই লয় । প্রেমেই জগৎ প্রকাশ পাচ্ছে, আর প্রেমেই কার্য লয় হচ্ছে ।

এই প্রেমই সর্বস্ব ! প্রেমময়ই তিনি । সেই অনন্ত সত্ত্বা অমৃত ।
প্রেমেরই আধার ।

ভাব বা এই প্রেমের পাঁচটি স্তর আছে । শাস্ত্র; দাস্ত,
ভাব কৃত প্রকার; সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা কান্তা প্রেম ।
উহার লক্ষণ । শাস্ত্রভাবই ভাবের প্রথম । শাস্ত্রভাবের বহু
ভক্ত আছে । যাদের ভগবানে নিষ্ঠা আছে, ভক্তি-বিশ্বাস
আছে, যারা তাঁকে বিশেষভাবে মান্য ও ভয় ক'রে চলে, আর
সংসারের প্রতি কিছু বিরাগ,—তারা ই শাস্ত্ররসের ভক্ত ।

এই শাস্ত্রভাবে আরাধনা কন্তে কন্তে দাস্তভাবের উদয় হয় ।
দাস্তভাবে খুব এগিয়ে গেছে । একেবারে তাঁর দাস হয়ে গেছে ।
তিনি প্রভু, আমি দাস । এভাবে খুব মমতা, শ্রদ্ধা, সম্মান
দেখায় । নিজে সতত সন্তুষ্ট থাকে । তাঁর দাসসাদাস ভেবে
সর্বদা তাঁর সেবা করে, ঐ সেবায়ই তার পরমানন্দের উদয়
হয় । দাস্যভাবের ভক্ত—হনুমান, গরুড়, হরিদাস, হীরামন
প্রভৃতি ভক্তগণ । আর বর্তমানে ঐ তোমাদের মহাবীরের—
অবতার রুদ্রানন্দ । প্রাণ একদিকে আর প্রভুর সেবা এক-
দিকে । প্রভুর ইচ্ছিতে, প্রভুর জন্য হেসে প্রাণ দিতে সদা
পরমানন্দ ।

রুদ্র যখন প্রথমে এখানে এলে, তখন কথা বলত । ওর
কথা খুব মিষ্টি ও গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের দেখে শ্রাব্যই সকলে,
ওকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত । আর
এখানে আদ্যা অবধি ওর অধঃ—“ভাব ছাড়, রসিক রইতে

না'র' হয়ে গিছিল । ভাবেই ২৪ ঘণ্টা বিভোর হয়ে থাকত, থাকতে ভালবাসত । এদিকে সময় সময় দু'একটা মধুর কথা ও মধু মুখে বলতে শুনে, লোকে ওর দ্বারা আরো কিছু শুনবার জন্য বায়না ধরছে । ও কিছুই বলছে না, ভাব দেখে রহস্যচ্ছলে তাকে বললেম—“ওগো, কথা বলতে হলে বলতেই হয়, আর না বলার ইচ্ছা হলে একেবারেই না বলা ভাল । • কোনও ভঙ্গীল নাই । মধু পাবার আশা না থাকলে আর কেউ গোঁচাবেও না ।” অমনি কথা বন্ধ করে দিলে । গুরুর মুখের কথাই মস্ত জেনে নিলে । শ্রবল সান্নিধ্যাতিক জবেও আর ভুলেও কথা বললে না । এক জীবন কথা না বলেই কাটিয়ে" দিলে । উঃ ! কি গুরুভক্তির আদর্শই জগতে রেখে গেল ! চোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়ে গেল ।

গোস্বামী হীরামন বাড়ীর কাজকর্ম ফেলে কেবল-কেবলই হরিঠাকুরের নিকট যেতো দেখে, একদিন তার বাড়ীর সন্তি-ভাবকেরা মিলে তাকে বেদম প্রহার করে । মা'র খেয়ে গাঁঁসাই গিয়ে ঠাকুরের নিকট নালিশ করে । ‘ঠাকুর’ বলেন—“তুমি ত আমাকে সর্বস্ব দিয়েছ, তবে আমার ও দেহটার ওপর তোমার অত মাথাব্যথা কেন ? যার যা করবার করুক গে । ভালমন্দ, লাভ-লোকসান যাকে দিয়েছ, সেই-ই দেখবে । তুমি কেন ?” অমনি চুপ হয়ে চলে গেল ! চৈতন্য এল । এবার তার ভাব পূর্ণ হোল । সুমুগ্ন সময় ভাবে একেবারে বিভোর হয়ে যেতো, হুশ থাকতো না ! কোন কাজকর্ম রীতিমত রুগ্ন পোত না ।

হয়ত জমিতে যেতে পথেই বিভোর হয়ে পড়ে রলন আর কাকু সঙ্গে কথ ও বেশী বলত না। আবার আপন মনে আপন ভাবে বিড়বিড় করে কি বলত, কেউ তা বুঝতে পারত না। পিতামাতা ছিল না। খুড়ো জ্যেষ্ঠারা রোগ ভেবে অনেক ঔষধ পত্র জোর করায়ে সেবন করালে, তাতে আরো শাগলামী বেড়ে গেল। শেষে এক মুসলমান ফকিরকে দেখালে। ফকির তার বায়ু শ্রবল হয়ে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটছে বলে লৌহ দ্রব্য করে তার সমস্ত শরীর পুড়িয়ে দিলে। তবুও তার ভাবের পরিবর্তন হোল না দেখে—হাত পা বেন্ধে হাত-পায়ের প্রতি আঙ্গুলের মধ্যে চৈতন্য করার জন্য খেজুরের কাঁটা বিদ্ধ করে দিলে, শেষে হাতের রৌলার দিয়ে মেরে অচৈতন্য করে রাখলে, এতে তার হুশ হওয়া দূরে থাক, আরো বেহুশ হয়ে গেল। মরবার সময় নিকটবর্তী জেনে ফকির পালালে। খুড়োরা খুনের দায় এড়াবার জন্য রাতে মৃত দেহ স্বেদ্য করে ঠাকুরের বাড়ী রেখে গেলে, দেখি ঠাকুর কী করেন! বাঁচে সেও ভাল, মলে ও আমাদের ঘাড়ে দায় চাপবে না। তোর রাত্রি ঠাকুর পায়চারী কতে বেরিয়েই পায়ে হীরামনের মৃত দেহ ঠেকেছে। তখন ঠাকুর আর কি করেন, তার গায়ে হাত দিয়ে চৈতন্য করায়ে কোলে লইলেন আর বল্লেন—“হয়ে গেছে, যাও, আর তোমার কিছু বাকী নাই। এখন জগতে এই ভাব ছড়াও।” মানুষ ছিল সেই একজন যেন ভাবের জলন্তমূর্তি! আত্মসমর্পণের পূর্ব বিকাশ! মানুষ হওয়া, তত্ত্ব হওয়া শক্তি

দুঃখ! জ্বালে পুনঃ পুনঃ পুড়ে গলে ছেকে শেষে মানুষ হয় ।

এর পর সখ্যভাব । সখ্যভাবে সখ্যভাব । সখ্য হয়ে তাঁর সেবা করা । আত্ম-সম-জ্ঞান । এভাবে—

“কাঁধে চড়ে, কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়ারণ,

কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন।”

এইরূপই হোল সখ্যভাবের কাজ । দাস্ত্যভাবে প্রভুকে সর্বস্ব সমর্পণ করে করে একেবারে প্রভু হয়ে যাওয়া, তাঁর সমান হয়ে যাওয়া । ব্রজের রাখালগণ এই ভাবের উপাসক । তারা এক-দিনও শ্রীকৃষ্ণসখা অদর্শন হয়ে থাকতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণও তাদের ছেড়ে রইতে পারেন না । তাদের হোল নিষ্কাম-নির্মল ভালবাসা-ঐশ্বর্যহীন ভালবাসা ! উচ্ছিন্ন ফল মিষ্ট বলে তাঁর মুখে তুলে দিত । উঁচুনিচু প্রভেদ ভুলে গিয়ে কভু তাঁর স্বন্ধে চড়ত, কভু তাঁকে স্বন্ধে চড়াত । তাঁকে রাখালরাজ্য করে কভু নবপল্লবের শাখা ভেঙ্গে চামর ব্যঞ্জন কর্ত, ছত্র ধরত । বন্ধু বিরহ তাদের অসহ্য । নিত্যানন্দ, অর্জুন, বলরাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি মুক্ত পুরুষগণই এই ভাবের ভক্ত ।

তারপর আসে বাৎসল্যভাব । ক্রমেই একত্বের দিকে-মিলনের দিকে যাচ্ছে । বাৎসল্যভাবে ভগবান বাল-গোপাল । প্রাণপুত্তলিকা, যথাসর্বস্ব অতিভাবক-অতিভাবিকা হয়ে, মাতাপিতা হয়ে, গুরু হয়ে কভু পুত্র কৃষ্ণার ন্যায়, কভু ভক্তের ন্যায়, ক্ষণে অদর করে, ক্ষণে তাড়মা করে, ক্ষণে আবার বন্ধমণি

ব’লে বক্ষে লুকায়ে রাখে। আত্মরূপে আত্মজরূপে সেবা করে, তাঁর মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করে। যেন তাঁর মা বাপ আর কি ? মনে হয় যেন কৃত্রিম—মায়া। কিন্তু তা নয়। ওর মধ্যেও সে যে স্বয়ং ভগবান অনন্ত সত্ত্বা সে বোধের কখন অন্বেষণ হয় না। শাস্ত-দাও-সখ্য ভাব ও তার মধ্যে থাকে। তবে বাৎসল্যভাবই অধিক থাকে। কিন্তু ভালবাসার প্রভাবেই এমন করে তোলে। রাজা নন্দ, মাতা যশোদা, শচীরানী, এরা এই ভাবের সাধক।

(শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের পায়ের নীচে একস্থানের “হাঁড়খোজা” অল্পখ দেখায়ে প্রায়ই বলতেন)—এটা আমার মায়ের অভিশাপ। মা এখনো যেমন আমাকে স্নেহ করেন, আবার ক্ষণে ক্ষণে কি যেন ভেবে আমার নাম নিয়ে তন্ময় হয়ে যান, ছোট বেলাও ঐরূপ ছিলেন। শুক্ল কালে প্রায়ই মাঠে “দৌড়ে” খেলতাম। মা কয়েকদিনই নিষেধ করলেন, কিন্তু শুনলেন না। একদিন দৌড়ে খেলার মাঠে যেতেই মা নিষেধ করে বললেন—“এরে, হাঁতি পা ভেঙ্গে যাবে, কাঁটাকুটা ফুটেবে।” যাস্না খেলতে। কিন্তু খেলার সঙ্গীদের টানে কি আর না যেয়ে পারি ? যেতে দেখেই রাগ করে বললেন—“নির্বংশে, আমার কথা যেমন মানলিনে তেমন তোর পায়ে যেন আজ কাঁটা ফুটে।” আহা, “দৌড়ে খোটে” গিয়ে পা দিতেই মস্ত এক খেঁজুরের কাঁটা বিদ্ধ হলো ! আমার কান্না শুনেই ত মা আবার দৌড়ে এসে কত আহা বাহা কহতে লাগলে। আর তাঁর অভিযন্ত্রণের জন্য নিজেকে পুনঃ পুনঃ

ধিকার দিতে লাগলে । কাঁটা ত সঙ্গীরা টেনে বের করে দিলে ।
কিন্তু মরা কাঁটা, সবটা বেরুলে না । তাই “হাড়গোজা” হয়ে
রয়ে গেল । এখন যখন এখানে হাত পড়ে তখন মায়ে
সতর্কের কথা মনে পড়ে । মা, বাপ, গুরু এদের কথা মানতে
হয় । তাদের অহৈতুকী ভালবাসা, তারা যে স্নেহ করে, ভাল
বাসে, তার বিনিময়ে কিছুই কখনো চায় না, শুধুই ভালবাসে,
ভালবাসাই তাদের ভালবাসা ।

এই বাৎসল্য ভাব হতে আরও যে প্রগাঢ় ভালবাসা তাহাই
মধুর কান্তা বা বন্ধু ভাব । স্বামীশ্রীতে, বন্ধু-বন্ধুতে যে ভাব,
সেইরূপ ভাব । কিন্তু বর্তমানে স্বামীশ্রীতে যে ভাব তা এভাবে
সঙ্গে তুলনা হয় না । বন্ধুভাবই মধুর ভাব । এ মধুরভাবে
সবই মধুর—

“মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভো মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্ ।

মধুগন্ধি মৃদুস্বতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥

ইহাই বিশুদ্ধ প্রেম ! তার নিকট প্রভুর শরীর মধুর, চলনে
বসনে মধুর, হাঁসিটি মধুর, মধুর গঞ্জে সব ভর পূর্ণ, সর্বরূপে
সর্বভাবেই মধুর । মধুর প্রভু ! “প্রভুই” মধুময় ! এখানে পূর্ণ
অধৈত ভাব ! সকল ভাবের পূর্ণ বিকাশ ভাব ! এ সেই ব্রহ্ম-
গোপীর নিগূঢ় অহৈতুকী মহা প্রেম ভাব । এর পর যা, তা
ভাব সমাধি, মহা সমাধি—মহাৎ নির্বাণ আর বলাবলী, লীলা
খেলা নাই । সব সমাধা, সব সমাধা, সব সমাধা, ওম্—ওম্ !

(শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব সমাধি)

ভাব কি ? একমাত্র তাঁর প্রতি নির্মল প্রাণ দেওয়া ভাল-
 প্রেম, প্রেমের বাসাই ভাব। এতে কোন জাতিবিচার নাই,
 বর্ণাশ্রম, তত্ত্ব ও, প্রভৃ। মানামান্ নাই, ভদ্রাভদ্র নাই, 'কোন প্রকার
 বন্ধনও নাই। মুক্তভাব হইতেই প্রেমের জন্ম। মুক্তি বা পূর্ণ
 প্রেমভাব একই বস্তু। ভাব সেই অনন্ত প্রেম সমুদ্রেরই
 "নাছ" উপকূল অংশ। এই ভাব নাছে থাকতেই তরীগুলি
 প্রেম তীরে চিৎকাৎ উতল-পুতল তাল বেতালে নাচতে থাকে,
 ভাসতে থ'কে। যখন মহাসমুদ্রে গিয়ে পৌঁছে তখন আর নাচা
 নাচি নড়াচড়ি নাই! সেখানের ভাব শাস্ত প্রশান্ত গস্তার স্থির
 মহামহিয়ান্ ! ইচ্ছা, অতল তলে ডুবে থাকে কি ভেসে যায় !
 বড়ই পবিত্র সে মহাভাব ! সে শুধু আনন্দ-মহানন্দ পূর্ণ-
 ব্রহ্মানন্দ !

এই ভাবেই তাঁর লীলা বিলাস ! ভক্ত ছাড়া তিনি এক
দণ্ডও রৈতে পারেন না, ভক্তেরও পারে না। তখন উভয়ের—

“রূপ লাগি অঁখি করে, শুনে মনভোর ।

প্রতি অঙ্গ লাগি কঁাদে প্রতি অঙ্গ মোর।” এই ভাব হয়।
চক্ষু সে রূপমাধুরী ভিন্ন অঙ্গ কিছু দেখতে পায় না, কণ তাঁর
মধুময় বাঁগী, তাঁর মধুময় গুণগান শুনতেই মুগ্ধ হয়ে যায়।
নাসিকার নিকট তাঁর মধুর শ্রীঅঙ্গের মধুগন্ধি বৈ আর কিছুই
ভাল লাগে না। রসনা তাঁর নাম কীৰ্ত্তনে ও কথনে এমনই
বিভোর হয়ে যায় যে, অঙ্গ কোন বোল উচ্চারণ কর্তে ইচ্ছা
করে না। “তাঁর মহা প্রসাদ বৈ অঙ্গ রাজভোগেও তৃপ্তি পায়

না। তাঁর সঙ্গে সদা মিলন হয়ে থাকবার জন্য স্বগেন্দ্রিয় ব্যার্কুল
 হৃদয়ে থাকে। তাঁর নিকট যেতেই চরণদ্বয় আনন্দে নেচে উঠে।
 তাঁর সেবারই হস্তদ্বয় পরম পরিতৃপ্তি পায়। তাঁর শ্রীচরণে মন্তক
 চিরকালের জন্য স্থায়ী যায়। আর সেত তার বক্ষমণি, 'হৃদয়ের
 ধন। অহো, "মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।" কি আর
 কহিব ? কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য সবই তার দিকে
 ঝুকে পড়ে, তাঁর দাস হতে চায়, দাস হয়ে তাঁর সেবারই স্থখী
 হয়। এমন পরম ভাবস্থ মহাত্মার দ্বারা কি আর কোন কষ্ট
 চলে ? তারে সবই যে তাঁতে সমর্পিত।

“ছোড় দই কুল কি মান ক্যা করে গা কোই ?”

জাকে শিরমোরমুকুট, মেবে পতি সোই।” কুলমানের
 মর্য্যাদা সব ত্যাগ করেছি ! কে কি আর কর্বেব আমার ! ষাঁর
 শিরে ময়ূর মুকুট সেইই আমার একমাত্র পতি একমাত্র গতি !
 আমার আর কিছুই দরকার নাই। আমি ছন্দিয়ার অঁর
 কিছুই চাই না। আর কিছুই ও য়র্ণালজ্জা বা ভয় রাখি না।
 ভক্তিমতী মীরাবাসীর এইরূপ ভাব হওয়ায় এইরূপ বহলপতি-
 পুত্র, কুলমান, রাজ্য-সুখটুক সব ত্যাগ করে, সব বাধাবিল্ল
 অতিক্রম করে একদিন শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-নিবেদন করে, “ঘর কৈল
 বাহির, বাহির কৈল ঘর” করে ছিল। তাঁর মত সতীতে দেশ
 ভরে উঠুক গো !

ভাট্টে মানুষকে উন্মাদ পাগল করে তোলে। প্রিয় বস্তুকে
 যদি-বহুদিন পর নিকটে পায়, তবে, আর তার হিতাহিত জ্ঞান

খাচ্ছে না । কোথায় খোবে, কি যে কর্কে আর কেবে পার না !
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বেদিন ত্রিকৃষ্ণ যেতেন, সেদিন জ্ঞান কি আনন্দ
হোত ! তাবে যে সে কোথায় রাখবে সেন্ধান খুঁজে পেতো না !
একবার বুকে নিত, একবার মাথায় নিত, আবার কখন কখন
বা মুখ চুখন কন্তে কন্তে কামড়িয়ে চোক মুখ লাল করে ফুলিয়ে
দিত ! কিন্তু অনন্ত প্রেমের ঠাকুর প্রেমের যে বান্ধা, যে যা ক'রে
সম্পৃক্ত, তাতেই সে সম্পৃক্ত ! আবার যখন শ্রীরাধা তাঁকে ঐ অবস্থায়
ফিরে পেতো, আর দেখত যে চন্দ্রা তাব প্রাণ বলভকে ঐরূপ
বান্ধনীর মত কামড়িয়ে দিয়েছে, তখন তার প্রতি যে কতখানি
বাগ হোত আর বলতো—“প্রিয়কে এই ভাবে কষ্ট দিতে
আছে। তার সুখই সুখী হতে হয় । তুমি ভাব সামলাতে না
পেরে সামান্য আত্ম সুখের মোহে পড়ে আমাদের প্রভুকে
কামড়িয়ে দিলে !”, সে তার কত যত্নের কত আদরের ধন !
তার বিন্দু কষ্ট ও যে সে সহ্য কন্তে পারে না । সে যে—তারে ফুল
বাসরে ফুলের শয্যায় রতন বেদীর উপরে বন্ধে ধরে সমাদরে
ভাবত কমলিনী রাই—উচ্চ কুচের আঘাত লেগে শ্যামাঙ্গে বেদনা
লাগে । আহা । রাই যে তারে রত্ন বেদীর উপর ফুলের বাসর
সাজিয়ে, তাঁরপর ফুলের শয্যা করে তরুপরি কমলিনী আপ্নি
শয়ন ক'রে তার বন্ধোপরি জগৎবল্লভ শ্যামকে রাখতেন ! তাতে
ও শোয়াস্তি নাই, বাই উচ্চ কুচযুগলে হস্ত দিয়ে বলতেন যে
কুচযু, কোমরা কোমলা হস্ত, তোমাদের আঘাত লেগে যেন
আমার শ্যামাঙ্গে বেদনা না লাগে । এরূপ বলতে বলতে

রাইয়ের কুচখর কোমল হয়ে গিছিল। যে পক্ষ রমণীর কুচখর কোমল, তারা রাধা অংশ স্বরূপিনী, প্রেমিকা বলে জানবে। শ্রীরাধাই জগতে শ্রীকৃষ্ণের সম্যক বহ্ন করিতে জানেন। তিনি হলেন ভাবরাজ্যের একচ্ছত্র সাত্রাজ্ঞী, তাঁর নির্মল নিষ্কাম অমূল্য প্রেমের এক এক ধূলি পরিমাণ পেলে জীব ধস্ত হয়ে যায়। প্রেমেরই শুধু প্রেমময় বান্ধা! প্রেম বিনা তাকে পাওয়া যায় না, রাধা যায় না। ওগো, পে যে বিনা প্রেম সে রোজাৎ নহি !

একদিন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করে—“সখে, এ জগতে তোমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে? শ্রীকৃষ্ণ বলেন—“বৃন্দাবনের ব্রজ-গোপীরাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত।” অর্জুন মনে ভাবছিল শ্রীকৃষ্ণ তাকেই নির্দেশ করবেন। কিন্তু তার নাম না বলে গোপীগণের নাম বলেন। এতে অভিমানী হয়ে অর্জুন “হঁ” দিয়ে বলে “আমার চেয়েও যে তোমার প্রিয় ভক্ত থাকতে পারে, তা চক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করি না।” তচ্ছুবণে শ্রীকৃষ্ণ উদাসীন ভাবে বলেন—“বিশ্বাস না হয়ত গিয়ে পরীক্ষা করে আসতে পার।” অর্জুন তখনি গাণ্ডীব হস্তে বৃন্দাবন যাত্রা করে। সে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে জীবন পর্যন্ত ত্যাগ কর্তে পারে, তাকে ভিন্ন জগতে আর কিছু জানে না, মানে না, তার চেয়েও বড় ভক্ত আছে, না দেখেই স্বস্তি হচ্ছে না। বৃন্দাবনে এসেই অর্জুন কুঞ্জে কুঞ্জে গোপীদের খুঁজে বেড়াতে লাগলে। এতোক কুঞ্জেই দেখে কুঞ্জবাসিনী নানা বিচিত্র রংএর সাজসজ্জা,

ও অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে অঙ্গে চন্দন লেপন কচ্ছে। তাদের হাবভাব দেখে কিছুই বুঝে ঠিক কত্তে না পেরে জিজ্ঞেস কল্লে—
 “ওগো, এখানে গোপীরা থাকে কোথা জান ? তারা উত্তর দিলে,
 “কেন, আম্মরাই তঁ এবনে গোপীগণ। তুমি কি চাচ্ছ ? তখন
 অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত বিলাসিনী গোপীদের দেখে একে-
 বারে চটে গিয়ে জিজ্ঞেস কল্লে—“আচ্ছা তোমরাই যদি গোপী,
 শ্রীকৃষ্ণভক্ত গোপী হও, তবে অঙ্গের অত সাজনা কচ্ছ কেন ?
 চন্দন পর্ছ কেন ?” গোপীরা বল্লে—“মশায়, চট্ছেন কেন ?
 এই যে আমরা সেজেছি, চন্দন পর্ছি, এ ত সেই শ্রীকৃষ্ণের
 অঙ্গেরই। তাঁর এসব অঙ্গ সাজালে, সুন্দর দেখালে তিনি বড়
 সুখী হন, তাই তাঁর অঙ্গই আমরা সাজাচ্ছি, আদর যত্ন কচ্ছি।
 এ অঙ্গে ত আমাদের আর বিন্দুমাত্র অধিকার নাই। সবই যে
 আমরা তাঁতে সঁপে দিছি।” এবারের উত্তরে অর্জুন আরো
 রেগে গেছে। ভাবছে ভগ্নাগুলো আমার সঙ্গে তামাসা কচ্ছে,
 আর শ্রীকৃষ্ণও তামাসা করে আমাকে এই তামাসা দেখাতে
 পাঠালে। আচ্ছা দাঁড়া দেখি তোরা কেমন শ্রীকৃষ্ণে সঁপে
 সঁপেছিস্, কেমন বন্দারনে বসে নিজ অঙ্গে চন্দন মেখে দ্বারকায়
 শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গে সঁপাচ্ছিস্?” বলেই গাণ্ডীবে তাঁর যোজনা করে তাদের
 প্রতি ছুড়তে থাক্লে। কিন্তু আশ্চর্য্য একে একে তার সমস্ত
 বাণ শেষ হয়ে গেল, তুণ শৃঙ্গ হোল, তবু গোপীগণের সঙ্গে
 একটি বাণও বিদ্ধ হল না, কোথা যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আর
 তারা পূর্বের মতই হাস্য মুখে চন্দনই মাখছে। অর্জুন আচ্ছ

বিজয় নাম রাখতে পাললে না, সামান্য গোপীদের নিকট পরাজিত হয়ে ক্ষোভে দুঃখে, রেগে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হ'ল । সেখানে গিয়ে দেখে আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার । কে যেন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গ বাণে বাণে একেবাবে বিদ্ধ করেছে । সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্তের স্রোতঃ বইছে । দেখে অর্জুন আরো রেগে গেল । “কে এমন কার্য্য করেছে, বল সখে, এখনই তার সমুচিত শাস্তি দিই ।” তখন শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হেসে বলে “অর্জুন চিন্তে পারছ না ? পাগল হয়েছে ? দেখ দেখি এ শরগুলো কার ? তোমার তুণ শূণ্য কেন ? দেখতে পাচ্ছ না ? এসবই যে তোমার কাজ । তুমি বিনা আমার অঙ্গে কে অস্ত্র বিদ্ধ কতে পারে ? গোপীতে আর আমাতে যে কোনই ভেদ নাই । গোপী অঙ্গও যা আমার অঙ্গও তা । তারা যে সবই আমাতে সমর্পণ করেছে ।” তখন অর্জুন লজ্জিত হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে প'ড়ে ক্ষমা ভিক্ষা নিলে । শ্রীকৃষ্ণ ও তাকে সাস্বনা দিয়ে তার শর গুলি খুলে পুনঃ তার তুণে ভরে দিলে । প্রেম কি সোজা ? প্রেম কি সামান্যে ঘটে, স্বজনি ! প্রেম নয় প্রেম কাঁচাসোনা, প্রেম যেন পবনমণি ! প্রেমিকে বলে—

“আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাহু তংরে বীল কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাহু ধরে প্রেম নাম ।”

প্রেম আর কাম আকাশ স্বাতাল তফাৎ । কামে একাই সন্তোষ কতে চায়, প্রেমে একাষ্ট তৃপ্তি হয় না, দশমানে সন্তোষ করাতেই তৃপ্তি । কাম স্বার্থ, প্রেম নিঃস্বার্থ । 'কাম' সঙ্কীর্ণ,

প্রেম বিস্তৃত । গোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণেই ছিল খাঁটি প্রেম ভাব । তাই অতঃ গোপীনা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম পূর্ণ হোত না । আর সকল গোপীসহ ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন না হলে পূর্ণানন্দ রাম রল হোত না । প্রেমিকে ভাবে, আমি বন্ধুকে, আমার প্রভুকে নিয়ে আনন্দ পাচ্ছি, অপর সকলে ও আমার বন্ধুকে নিক, পা'ক, পেয়ে আনন্দ পা'ক । তবেই তার সুখের পরিহৃপ্তি ।

যারা খাঁটি প্রেমিক, খাঁটি ভক্ত, তারা সেই প্রেমময়ের নিকট কিছুই চায় না, চাইতে পারে না । আর তারা বলতে ও পারে না, কেন প্রেমময়কে ভালবাসে । যদি প্রশ্ন কর, বলবে— “ভালবাসি বলে ভালবাসি, ভালবাসতে ইচ্ছা করে বলে ভালবাসি ।” দ্রৌপদী একদিন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিল “মহারাজ, তুমি সর্ববন্ধুই সর্বকারণ্যেই ধর্ম্মকে মেনে চলছ, রক্ষা করে চলছ, কিন্তু ধর্ম্ম তোমাকে একদিন ও রক্ষা করে না, একবার ও তোমার দিকে চাইলে না ?” উত্তর হোল “ঐ প্রশান্ত গম্ভীর মহান হিমালয়ের দিকে চেয়ে দেখো,—দেখো, দ্রৌপদী কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে । তুমি কি ও সৌন্দর্য্য না দেখে পার উহা ভাল না বেসে কি পারা যায় ? ও ত পাথর, ও তোমায় আমায় কি কাউকে কিছুই দেয় না । কিন্তু ও ভাল জিনিষ কি ভাল না কেনে পারা যায় ? ধর্ম্ম ও তাই । ভাল, তাই ভালবাসি । উহা আমাকে কিছু দিক্ বা না দিক্ । আমি ত আর ধর্ম্ম বণিক নই ! ধর্ম্মের রক্তাকেনা করিনে ! যে ভালবাসার প্রতিদান চাই, আমার স্বভাব, যা ভাল তাই ভালবাসা ।

ভালবাসাই ধর্ম । মানুষেতে নিষ্ঠা ভক্তিই মাত্র সার ।
 জীবে দয়া, নামে রুচি, মানুষেতে নিষ্ঠা ; ইহা ছাড়া আর যত
 সব ক্রিয়া ভ্রষ্ট । নামেতে রুচি, সর্বজীবের প্রতি দয়া, আর
 মানুষেতে—মানুষ ভগবানের বহু মূর্তিতে বিশ্বাস—ভক্তি ও সেবা
 যে করে সেই ধন্য, সেইই যথার্থ পূজা করে । এছাড়া আর
 কোন ক্রিয়া নাই, কোন পথ নাই, ধর্ম নাই । 'সদাই তোমরা
 প্রেম ছড়াও । প্রেমের নিকট লাভালাভ নাই, জাত বিচার
 নাই, ভেদাভেদ নাই, ছোট বড় নাই, স্ত্রীপুরুষ নাই, এমন কি
 জীবজন্তু, বৃক্ষলতাদি স্বাবরে ও নির্বিচারে প্রেম দাও । যাকে
 সামনে পাবে তাকেই ধরে প্রেম দাও, কোল দাও, তার সাথে
 মিশে যাও । আমার এ পঞ্চভৌতিক দেহটাকে শুধু ভাল-
 বাস্লে ভালবাসা হয় নারে ! ও আমার নিকট এসে পৌছায়
 না আমার অনন্ত মূর্তি অনন্তরূপ । সব তার মধ্যে আমি আছি ।
 সব তার মধ্যে আমাকে জেনে সবতা নিয়ে থাকো । সবতায়
 আমাকে দেখে আমায় হয়ে যাও, আমি হয়ে যাও, ডুবে যাও ।
 ও শান্তি হরি ও ।

সাধু-সঙ্গ ।

সাধু সঙ্গের লক্ষণ (শ্রীশ্রীঠাকুর গাইলেন)—
কিরূপ ।

সাধুর সঙ্গতে প্রাণ জুড়ায় রে,—

শীতল হয় রে তাপিত অঙ্গ ।

সাধুর গুণত যায় না বলা,

তার চিত্ত শুদ্ধ অন্তর খোলা,

দর্শনে যায় মনের ময়লা রে—

স্পর্শনে হয় প্রেম তরঙ্গ ।

সাধু যদি দয়া করে,

চাঁদ গৌরু দিলে দিতে পারে ;

আপন রং ধরাইতে পারে রে—

তাইরে বলি অন্তরঙ্গ ॥

অহো, এইই হোল সাধুর স্তাব । আপন রং ধরায়ে তবে
ছাড়ে । তার সঙ্গ প্রাণ শীতল হয়ে যায়, সে যে কি আনন্দ !
ওগো সই, সে সঙ্গের সঙ্গী বিনা তা কেউ জানে না । তোমরাই
সেই আনন্দ পুরোপুরিভাবে পাচ্ছ ! এই স্থানই এখন স্বর্গ,
গোলোক ধাম ! সাধুসঙ্গ-সাধু-সঙ্গ, ওম্ (ভক্তগণ সঙ্গ শ্রীশ্রীঠাকুরের
ভাব সমাধি) ।

‘সাধুরা কিছুই অপেক্ষা রাখে না।’ তারা পূর্ণ, সাধীন, ‘স্বাবলম্বী’ সর্বত্র সর্ববস্তুতে ব্রহ্ম জেনে তাঁতে ভক্তিমান।—তাঁরা বিলাস জেনে সকলেই তারা প্রেম করে। জগতে তারা মাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, শত্রুহীন স্বতন্ত্র। তাদের বস্তুধৈব কুটুম্ব। তারা সুখে দুঃখে স্তুতি নিন্দায় উদাসীন, তাদের দ্বারা কেউ উদ্বিগ্ন ও হয় না, তারাও উদ্বিগ্ন হয় না।—“দুঃখেষু নুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগত স্পৃহাঃ।” কোন কামনা বাসনা, কোন অহঙ্কার নাই। আছে কেবল দয়া, ভালবাসা, হৃদয়ে প্রেম অনন্ত প্রেম, প্রেমই সর্বস্ব। সৌম্য প্রশান্ত তাঁর মূর্তি।

প্রভু বলেছেন—‘আমার ভক্তগণ ব্রহ্মহ, ইন্দ্রহ, এমন কি মোক্ষহ পর্য্যন্ত চায় না। তারা চায় শুধু আমাকে। আর কিছুতেই তাদের অভিলাষ নাই।’ এতদূর না হলে কি ভক্ত হওয়া যায়? ভক্ত হওয়া শক্ত কথা, শাক্তরাই ভক্ত।

যখন রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার ক’রে বন হতে অযোধ্যায়। সংহাসনে এসে বসুলেন, তখন একদিন সকলকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। সমস্ত উপহার যখন সকলকে দেওয়া শেষ হয়েছে, এমন সময় হনুমান এসে উপস্থিত হোল। তখন ঠাকুর ‘আর কি দেবেন? নিজের গলার হার তার গলায় পরায়ে দিলেন! সকলেই হনুর ভাগ্যের প্রশংসা কলে। হনুমান ও পরম পুখী হল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখলে,—হনুমান প্রভুর গলার হারছড়া দাঁতে চিবিয়ে, দূরে ফেলে দিলে। দেখে সকলের—বিশেষ লক্ষ্মণের বড় ক্রোধ হোল। সে বলে ও বনের

বানর, কলাকচু খেকৌ ভক্ত, ও প্রভুদত্ত হারের মূল্য বুঝবে কি ?
ভক্ত অপমাননা দেখে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ওর কাবুণ হনুমানের
নিকট শুনতে বল্লেন । লক্ষ্মণের কথায় হনুমান বল্লেন—“প্রভু,
প্রথমে মনে করেছিলেম—এ প্রভুর গলার হার, এতে বুঝি
প্রভুর সখা আছে, শাস্তি আছে, ভেবে গলায় নিলেম । শেষে
যখন দেখ্লেম এতে তা নাই, তখন ফেলে দিলেম ।” লক্ষ্মণ
বল্লেন—“তোমার শরীরেত রামচন্দ্রের কিছই নাই, তবে ওটা ব্যয়ে
নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন ?” হনুমান তখন রাগভরে বিরাট মূর্তিতে
আপন বক্ষ চিরে ভিতরে সীতারাম যুগল মূর্তি সকলকে দেখায়ে
বিস্মিত কল্লেন । তার হাড়ে হাড়ে রাম নাম লেখা ছিল । রাম-
রূপ ধ্যান কন্তে কন্তে তার শরীর রামবর্ণ হয়ে গিচ্ছিল । আজও
সমস্ত কপি জাতি রামবর্ণ ধরে আছে । হনুমানজী ছিল সেযুগে
ভক্ত শ্রেষ্ঠ, ভক্ত অবতার । ভক্তেরই প্রভুদাস । “ভক্তমম
মাতা পিতা, ভক্তমম গুরু, ভক্তেতে রেখেছে নাম বাঞ্জা কল্লতরু ।”
ভক্তই তাঁর সব । • যেখানে ভক্ত, সেইখানেই তিনি । ভক্তের
নিকটই তাকে পাওয়া যায় ।

• • সাধুদের চেনা বড় দায় । কেহ কেহ লোকের উৎপাত হতে
রক্ষা পাবার জন্য উন্মাদের বেশে ঘুরে বেড়ায় । কেউ কেউবা
বালকের স্বভাব নিয়ে চলে যে, কেউই ধন্তে পারে না । • আবার
কেউ সহজভাবে সাধারণ মানুষের মত সব তা নিয়ে সবজ্ঞার মধ্যে
থাকে, অন্তরে অন্তরে সাধুত্ব পোষণ করে চলে যায় । আর
যারা নিজের জ্ঞান না এসে পনের জ্ঞান আসে—তারা সমস্তই

প্রকাশভাবে বিলিয়ে দেয় । তবে যে যা পাবার উপযুক্ত, সেইই তা পেয়ে থাকে । হারে, সাধু না হলে সাধু চেগা যায় না, ধরা যায় না । আগে সৎ হও, সত্য কথা বলো । সত্য ভাল-বাস্তে শেখো, বিশ্বাস কর, তবে সাধু পেতে পারবে ।

রাজার নিকট যেতে হলে যেমন চৌকিদার, দফাদার, ফৌজ-সাধু ও সাধু দার, লাটবেলাট প্রভৃতির হাত হয়ে যেতে সম্ভব মহাত্মা । হয়, তাদের সাহায্য নিয়ে যেতে হয় । তদ্রূপ ভগবানের বিকট যেতে হলেও দারোয়ান, ফৌজদার প্রভৃতি ভক্তদের নিকট হয়ে, তাদের অনুমতি নিয়ে যেতে হয় । নতুবা যাওয়া যায় না । সাধুসঙ্গ ভিন্ন তাঁর কাছে যাবার আর কোন সরল সোজা পথ নাই, কোন উপায় নাই ।

যেমন পণ্ডিত হতে হলে পণ্ডিতের নিকট, উকিল হতে হলে উকিলের নিকট ডাক্তার হতে হলে ডাক্তারের নিকট যেতে হয়, তদ্রূপ সাধু হতে হলে সাধুর নিকট—ভক্তের নিকট যেতে হয় । যার নিকট যা আছে, তার নিকট গেলেই তা পাওয়া যায় । আগুন গরম, ওর কাছে গেলে গরম পাবে । বরফ ঠাণ্ডা ওর কাছে গেলে ঠাণ্ডাই পাবে । এক এক বস্তুর এক এক স্বাভাবিক গুণ আছে । আর তা নিয়তই চতুর্দিকে ছড়াচ্ছে প্রক্ষেপ কচ্ছে । ভক্ত ভগবানের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক । তাঁর পবিত্রত্বের ঘনমূর্তি । আর তারা মানুষের অতি নিকটবর্তী । এক সূর্য্য যেমন প্রকাশ হয়ে তার গিরণমালায় সমস্ত জগৎ উজ্জ্বল করে দেয়, তেমন যেখানে একজন সাধুযুক্তি অবস্থান

করেন, তাঁর প্রভাবে তাঁর চতুর্দিকের বহুদূর পর্য্যন্ত পবিত্রতার
ওজ্জ্বল্যে আলোকিত হয়ে থাকে, সেই রশ্মির মধ্যে যে, যে,
যাহা যাহা পড়বে, তারাই আলোকিত হয়ে উঠবে ।

ওগো—

“সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ং বৃহৎ ।

‘মদন্যন্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥”

সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয় । তারা আমা
বৈ আর কিছুই জানে না, আমি ও তাদের বৈ আর কিছুই
জানি না । ভক্ত আর ভগবান এক । লীলায় পৃথক দেখাচ্ছে
মাত্র ।

‘সংগ্রন্থ পাঠও সাধুসঙ্গের এক অঙ্গ । উহা সর্বদা সঙ্গে
রেখে ভক্তিপূর্বক পাঠ কর্বে, শ্রবণ কর্বে, কীৰ্ত্তন কর্বে,
দশজনকে ও শুনাবে । এতে আত্মা পবিত্র হবে, সং হবে ।
কিন্তু জান্বে ভক্তসঙ্গ ভিন্ন তাঁকে পাওয়া যায় না । ভব পারা-
বারের আর ভেঁলা নাই—“ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা ।

‘ভবতি ভবান্নবে তরণে নৌকা ।”

সাধুদের গুণের কথা, সাধুসঙ্গের গুণের কথা একমুখে বলে শেষ
করা যায় না । সর্বতীর্থ স্বরূপ তারা । সর্বতীর্থফল দায়ক ।
তাদের কৃপায় সুখ হয় । ॐ মা ।

সমাজ তত্ত্ব ।

মানব মণ্ডলীকে শান্তিতে রাখার জন্ত এক এক মহাপুরুষ
সমাজ ও জাতি, এক একটা বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়ে বলে
উহার প্রয়োজনীয়তা। গেছেন। কতকগুলি লোকে কার্যের সুবিধার
জন্ত মহাপুরুষবাণী বা শাস্ত্রের বচন কি প্রথা মনে ক'রে উহা
পালন করে চলে, যে উহার অগ্রথা করে, তারা তাকে তাদের
দলে স্থান দেয় না, বা দিলেও সেই অগ্রথার সংশোধন করে
নিতে হয়, এই যে একতাবদ্ধ ভাবে জীবন যাত্রা চালাবার
প্রণালী ইহাই সমাজ। ঐ নিয়মগুলি পালন না কলে সর্ব-
সাধারণের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটে, অত্যাঁয় অধর্ম দেখা দেয়।
আর নিয়মিত ভাবে সকলে পালন করে চলে কোন অশান্তির
কারণ হয় না। এইসব সামাজিক বিধি দেশের অবস্থা ও
সময়ানুযায়ী তৈরী হয়, আবার সময় ও অবস্থার পরিবর্তনে উহা
পরিবর্তন করে নিতে হয়। বস্তুতঃ ঐ সব সামাজিক বিধিকে
অপরিবর্তনীয় বেদবাক্য বলে মেনে নেওয়া বড়ই নির্বুদ্ধিতার
পরিচায়ক; কারণ সমাজতত্ত্ব বেদের কর্ম কাণ্ডে, কর্মকাণ্ড পরি-
বর্তন শীল; উক্তান কাণ্ড অপরিবর্তনীয় সময়ানুসারে ঐ কর্মকাণ্ডের
পরিবর্তন না হলে বহুলোকের বহু প্রকারের অভাব ও অশান্তি
ভোগ কতে হয়। আজ হয়ত এদেশে যা কর্তব্য, হাজার বৎসর

পূর্বেই তা এদেশে অকর্তব্য ছিল। হয় ত উহা অন্য দেশে আবার কর্তব্য ছিল। এই রূপেই ত সমাজ চক্র ঘুরছে। 'গরমের সময়' একরূপ খাবার পরবার চাই, শীতের সময় আর ক্রুপ খাবার পরবার চাই। শীত প্রধান দেশে একরকম, গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অন্য রকম। এসব নিয়ম ভাল। কিছু কিছু বন্ধন থাকা ভাল, কিন্তু তাই বলে অতিরিক্ত ভাল নয়! অতিরিক্ত নিয়ম-আচারকে অত্যাচার অতি-আচার বলে। অসুবিধা হলে চিরকালের জন্য কোন অপরিবর্তনীয় বন্ধনকেও মেনে চলতে নাই। অনেক মুক্ত পুরুষেও দেশের দেশের উপকারার্থে কতকগুলো সু-নিয়ম পেলে চলে থাকেন। কিন্তু তাদের নিজেদের জন্য কিছু মানবার পাল্‌বার দরকার থাকে না। তবু তারা দেশের জন্য স্বেচ্ছায় বন্ধন পরে নেয়।

প্রাকৃতিক জাতি দুই প্রকার-পুরুষ ও প্রকৃতি। তা ছাড়া—মুন্সুফ, পশু পক্ষী, বৃক্ষলতা তীর্থাগাদি বহু জাতীয়, প্রাণী আছে, তাদের ও এক এক জাতি বলে। ইহা ঈশ্বর সৃষ্ট। কিন্তু ইহা ভিন্ন গুণানুসারে মানব সমাজে যে জাতি বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল, যা এখনো একটু আছে তা ভাল! উহাতে সম্মুখে উচ্চ উচ্চ আদর্শ দেখতে পেয়ে প্রত্যেকেই উন্নতির পথে ঊর্ধ্বে চেষ্টা করবার সুযোগ পায়। এই জাতি তিন প্রকার গুণে তিন প্রকারে বিভক্ত, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ। যারা ব্যবসায় বাণিজ্য করে, পরের বশ্যতা স্বীকার করে চাকরী করে জীবিকা নির্বাহ করে, যারা তমঃগুণী তারাই বৈশ্য নামে অভিহিত হয়।

যারা ক্ষেত্রের কার্য্য করে, ফসল উৎপাদন করে, ক্ষেত্র—দেশ শাসন, পালন ও রক্ষণ করে, যারা স্বাধীন, বীর, রজঃগুণী তারাই ক্ষত্রিয় নামে অবিহিত হয়। আর যারা জীবন্মুক্ত সত্ত্বগুণী মহাপুরুষ, যাদের নিজের ব'লে কিছু নাই, কিছু করবার ও নাই, যারা নিকাম ভাবে সারা জগতের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম ক'রে থাকে, ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে থাকে, যারা ব্রহ্মকে জেনে অন্যকেও উহা জানাতে চেষ্টা করে থাকে, তারাই ব্রাহ্মণ নামে অবিহিত হয়। আজ-কাল যাদের সাধু বলে। অর্থাৎ ভ্যাগী-কর্ম্মী, মুক্ত পুরুষ শ্রেণী।

এই জাতিত্রয় হিন্দু, মুসলমান, কৃষ্ণচান বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষ নারী, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ প্রত্যেক মানবের মধ্যেই গুণানুসারে রয়েছে। তবে কারু মধ্যে কোনটা বেশী আর কম। যার মধ্যে যেটা বেশী সে সেই জাতীয়ের অন্তর্গত। এই জাতি বিভাগ বহুযুগ পূর্বে প্রত্যক্ষদর্শী ঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল। আজকাল আর সেভাবে—সত্যকার জাতি বিভাগ নাই, হয় না। জাতি গেছে—বংশের মধ্যে, রক্ত মাংসের মধ্যে, ছুঁৎ-মাংগের মধ্যে। গুণের মধ্যে আর কোন জাতি নাই। দেশটা এই করে করে এখন একেবারে উচ্ছিন্নের দিকে যেতে বসেছিল। কিন্তু যদিও পূর্বের মত আর জাতি ফিরে পাওয়া যাবে না, আর দরকারও নাই, তবু সব কৃত্রিম জাতি বিভাগ করে এক জাতির দিকে আঁকড়ে হবে। এখন এক জাতিই সব হবে। নতুবা ভারতের উদ্ধার নাই। বৈদিক হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠ রক্ষা

পারবে না । তাই সব এক জাতি হতে হবে, দেশে শান্তি আনতে হবে, শেষে আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ত্রিজাতির সৃষ্টি হবে । বর্তমানে ভারতে বৈশ্য আছে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বিরল । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই ত্রিজাতির মধ্যে যথাক্রমে ত্রিগুণের সম্যক প্রকাশ না থাকলে কোন দেশেই কোন কালেই শান্তি থাকে না । উন্নতি না হয়ে অবনতির দিকে যায় । কত শ্রেণীর কত দেশের লোক একারণে ধরা হতে লুপ্ত হয়ে গেছে । সব চাই । সব তাই চাই—বেঁচে থাকতে হলে ।

এখন সমাজের গুলটপালট পরিবর্তন হবে । কে করবে, বর্তমানে সমাজের কেমনে হবে, ঠিক কর্তে পারবে না । আপনা কর্তব্য । হতেই সবার প্রাণে আসবে । সকলেই উহার পরিবর্তন আনবে । এ পরিবর্তনে কেউ বাধা দিও না । যে বাধা দিবে, সে গিছিয়ে যাবে । প্রত্যেক করবে সমস্ত পুরুষ জাতি তোমাদের ভাই এবং সমস্ত নারী জাতি তোমাদের ভগ্নী । যে, যে উপাসক হোক, তাতে ক্ষতি কি ? বরং সে বিষয়ে তাকে সাহায্য কর, নিজেও উপাস্তর । প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী রও । যে এর উল্টো করবে, গোঁড়ামী করবে, বীরত্বের সহিত তার প্রতীকার কর, তবেই ত ধার্মিক । যে যেক্রমে, যে নামে ডাকে ডাকুক । যদি কেউ তাতে বাধা দেয়, তবে সেত নিজের উপাস্তরই অপমানমা কচ্ছে । কেন না—বস্তু এক, ইতে নাহি ভুল ।

খাটি সমাজ বলে কীকি? বাহা ধনো-জ্ঞানী, গরীব-দুখ

নরনারী, শিশু-যুবা-বৃদ্ধ সকলেরই সকল প্রকারের অসুবিধা দূর
ক'রে সুবিধা এনে দেয়—তাহাই সমাজ । এর মধ্যে কার-
একটু কষ্ট অসুবিধা ভোগ কন্তে হলে জানবে যে এ সমাজের
মধ্যে গরম আছে । আর তখনই উহা খুঁজে বের কন্তে চেষ্টা
কর্বে ।

মানুষ ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই স্ত্রী পুরুষ সকলেই
মাতৃজাতিকে সমান সমান ও স্বাধীন । মানুষের মত শ্রেষ্ঠ
আসন দাও ।
প্রাণীতে তার অগ্রথা হলে চলবে কেন ?
পাশ্চাত্যে মেয়ে পুরুষ সকলেই সমান ও স্বাধীন, তাই তারা
ছনিয়ার রাজা । সমস্ত জগৎ যেন তাদের ইচ্ছিতে চলছে ।
সমাজের উন্নতি চাওত মাতৃজাতিকে ওদের মত, এর পূর্ব-
পুরুষদের মত স্বাধীন ও সমান অধিকার দিতে হবে । যতদিন
ভারতের মেয়ে ও পুরুষ সমান ও স্বাধীন অধিকার পেয়ে
আসছিল, ততদিন ভারতবাসীদের সুখশান্তি ছিল—মেয়েরা
অন্নপূর্ণা ছিল । যদি সুখ স্বচ্ছন্দ চাও, তবে মেয়েদের আগে
স্বাধীন করে দাও । স্বাধীন হতে তাদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে
সাহায্য কর । মনে করোনা যে তা হলে কি শেষে ভাত রেক্কা
খেতে হবে ! তা নয়, বার বা সাজে, সে তা সাজবেই । ওগো,
মাতৃজাতিকে সমান আসন দাও । তাদের বন্ধন মুক্ত কর ।
যেখানে ঐ মায়েরা সুখে থাকে, সেখানে নিজে আনন্দদায়িনী
মা বিরাজ করেন । “যত্র নারীযন্ত নন্দ্যন্তে নন্দ্যন্তে তত্র দেবতা ।”
“স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকল জগৎসু” “নারীদণে যেখানে আনন্দে

থাকে, দেবতার। সে গৃহে আনন্দে নৃত্য করে। স্ত্রীজাতিই সমস্ত জগতের আনন্দকামিনী, আনন্দ দায়িনী। জ্ঞানবে এক পক্ষে নর করে যেমন পাখী আকাশে উঠতে পারে না, তদ্রূপ সমাজের অঙ্গবয় নর কি নারী এর একটিকেও বাদ দিয়ে সমাজ উঠতে পারে না, জাগতে পারেনা। নরনারী নিয়েইত সমাজ, মনুষ্য জাতি।

ভারতে বিধবা বিবাহ নিত্য প্রয়োজন। অঙ্গ হত্যাপাতকে, নারীগণের মর্শ্বেভেদী গভীর তপ্ত অভিসম্পাতে বিধবা-বিবাহ। থাক্ হিন্দু সমাজ, সমস্ত ভারতবর্ষ ডুবে যেতে বসেছে। আনন্দদায়িনী স্নেহবতী মায়েবা পুত্র-কন্যা হত্যা কস্তে কস্তে রাক্ষসী, মূর্তিতে এসে বর্তমানে দেখা দিচ্ছে। রাক্ষসী আর কে? কে কবে কোন্ দেশে শুনেছ—মাতা নিজের সন্তানকে হত্যা করে? পাপ আর কাবে বলে? নরক আর কোথায়? ঘরে ঘরে নরহত্যা, নিম্পাপ নির্দোষ শিশু হত্যা হচ্ছে, আর তোমরা আরামে উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম ধর্ম কচ্ছ? অধঃপাত আর-ক্লারে বলে? মানুষ অতি নিম্নে চলে গেলে সে আর উচ্চ ভাব ধারণা কর্তে পারে না। যেখানে থাকে তাহাই ভাল মনে করে। সদৃশ জ্ঞান হারাবে কেলে। যদি এরা পুনঃ বিয়ে করে, সন্তান সন্ততি জন্মায়ে সমাজের কলেবর বৃদ্ধি করে, সুখে স্বচ্ছন্দে থেকে, ঘর গৃহস্থালী করে, তাতে কত ক্ষতি! কত লাভ! তোমার কন্যা-বোনে যদি শান্তি পায় তর্কতৌমাষ অশান্তি কেন? মানুষ যদি জ্ঞানবান, উচ্চধর্মী অহিংসধর্মী হিন্দু

যদি তোমরা, শ্রায়বান যদি তোমরা, তবে তোমাদের এমন ঈর্ষ্যা
এখন পর-স্বখে, আত্মস্বখে কাতরতা আসে কেন ? এত উৎকর্ষ
কেন ? আমাকে পাগল বলো কেন হে ? তোমরাই যে পাগল হয়ে
আছো ! আমি সত্যি সত্যি দেখি । আর তোমরা পাপকে পুণ্য
পুণ্যকে পাপ বলে উল্টা দেখো । তোমাদের মস্তিষ্কই যে
বিকৃত । পাগল যে তোমরাই । দেখছ না, কোটি মেয়েকে
তোমরা রাক্ষসী বনিয়ে তাদের মুখের সন্মুখে অহাংরীয় হয়ে
দাঁড়ায়ে আছ, আর তাদের মুখায়ি গহ্বরে তোমাদের এ মুষ্টিমেয়
হিন্দুর দল পুড়ে পুড়ে ভস্ম হতে কদিন লাগবে ?

যদি মুক্তি চাও, প্রকৃত শাস্তি চাও,—ও লম্বা লম্বা বুলি
ঈশ্বর ফিখর ধর্ম ধর্ম দিয়ে কাজ নাই । ও সব পারো পরে
করো, না পারো নাইবা হোল । ঐ সব টুপটাপ, ঢং ঢাং.
ছুং ছাং কি ধর্ম হে ? ও সব ঢং ঢাং তর্ক যুক্তি, রেখে
দিয়ে আগে এই অসহায়্য দুর্বলতা অশিক্ষিতা, মাতৃজাতির
উদ্ধার কর, মুক্তির দোর ছেড়ে দাও, শক্তিময়ী কর ।
ধর্ম ধর্ম ক'রে চেঁচাচ্ছ কেন ? চীৎকারে কি কিছু হয় ?
হয় কাজে । আগে মাতৃজাতির অভাব দূর কর । মাকে মুক্ত
কর । উদ্ধার কর, জাগাও ।

বিবাহ অর্থ বন্ধন, প্রেমের বন্ধন, পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ
হওয়া । ভালবাসায় মিলন হয়ে একযোগে
ব্যবহারে বিবাহ ।

জীবন বাপন করা । এই ভালবাসা এই
দীপ্তি পুরুষে পুরুষে বা মেয়ে মেয়ে হলে সমাজে বলে বন্ধু

আর মেয়ে পুরুষে হ'য়ে একত্রে সমাজ বন্ধন ক'রে হ'লে বলে বিবাহ । বিশুদ্ধ প্রেমের মিলন হতে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানই প্রেমিক, বীর হির একতাবলম্বী সাধু ও মিলনকাজক্ষী হয় । আর বলাৎকার বা কামের উত্তেজনায় ব্যভিচারের ফলে যে সন্তান জন্মে তা অপ্রেমিক, বিভাগকারী, কামুক, খল, অবিশ্বাসী ও বিভিন্নমুখী হয়ে থাকে । আজ কাল হিন্দু সমাজের কৃত্রিম আনুসঙ্গিক বিবাহের ফলেই হিন্দু সমাজ বিভিন্নমুখী, একতাবিহীন হয়ে, অবিশ্বাসী হয়ে, দয়ামায়াহীন হয়ে, দুর্বল হয়ে দিন দিন ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে । এই ধ্বংসের পথ রুদ্ধ কত্তে হলে আবার সমাজে সাবালক অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করেছে এমন অবস্থায় ছেলে মেয়েকে পূর্বের ন্যায় স্বয়ম্বর প্রথায়, বর কন্যার পরস্পর প্রাণের মিলন হলে তবে বিবাহ দেওয়া কর্তব্য । তবেই তাদের মধ্যে পরস্পর প্রীতি জন্মাবে, প্রেম জন্মাবে । আর তাতেই সমাজ, প্রেমিক, সৎ, বীর, পণ্ডিত, ও শক্তিবন্ত সন্তান সমৃদ্ধি পেয়ে বলা হবে । আবার জগতে জ্ঞান-বিভ্রম, বেদ-বৈদান্ত বিকোণ করবে । নিজে ধন্য হবে, অন্যকেও ধন্য করবে ।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ২০২৫ বৎসর পর্যন্ত ছেলে মেয়ে

উভয়েরই ব্রহ্মচর্য পালন ও জ্ঞান অর্জন

ব্রহ্মচর্য পালন ।

করাতে হবে । ব্রহ্মচর্যই জীবন । ব্রহ্মচারী-

ব্রহ্মচারিণীই প্রকৃত পূর্ণানন্দের অধিকারী । এই বিশ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষালাভ কর, পণ্ডিত হও, বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক, পণ্ডিত হও,

বোঝা হও, কর্তব্য কর্ম করে নাও, বুকে নাও, শেষে যা ইচ্ছা করিবে বেড়ায়ো । এই বিশ বৎসরের মধ্যেই মানুষের যা হবার তা হয়ে যায়ন অর্থাৎ শরীরের ও মনের পূর্ণ গঠন হয়ে যায়, তারপর আর বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না, কেবল উহার বিকাশ হতে থাকে, সৌষ্ঠব হতে থাকে । বর্ধ্যাবান ও পণ্ডিত জনক-জন্মনীতে দেশ ভরে উঠুক ।

ভারতে বহুকাল পূর্বের বহুকাল পর্য্যন্ত সন্তান যুবকই ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত থেকে শেষে বিবাহ ক'রে গৃহী হ'ত । তন্মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা ক'রে কীর্ত্তি অর্জন ক'রত । কীর্ত্তিক হ'ত ! সকলেই স্বাস্থ্য সম্পন্ন বলবান ছিল । প্রত্যেক যুবক যুবতীরই প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে শেষে গৃহী হওয়া কর্ত্তব্য কর্ম, কর্ত্তব্য ধর্ম্ম । নতুবা অনধিকারের পরস্বাপহরণের, পাপভাগী হ'তে হয় । ব্রহ্মচর্য্য পালন না ক'রে বিয়ে ক'রে গৃহী হ'য়ে জীবন কাটায়েই ত আজ ভারতবাসী দুর্ব্বল হ'য়েছে । আগে দেহ ঠিক ক'রে নাও, শেষে যা হয় ক'র ।

দেশ ও কালের উপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ পন্ন হইবে ।

পরিচ্ছদ ।

পরার উদ্দেশ্য লাজ্জা নিবারণ করা, শীতাতপ হতে শরীর রক্ষা করা । তার বেশী আড়ম্বর চাক্চিক্য করা—বিলাসিতা, বাবুগিরি মাত্র । বিলাসিতা ত্যাগ কর্বে । বিলাসিতায় পেলে আর রক্ষা নাই, ইহকাল পরকাল জাহান্নামে যাবে, নরকে যাবে । বে পোষাকে পবিত্রতা আনে, স্বদয়ে প্রশান্তি আনে তাহাই উত্তম পোষাক । তবে পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন চাই। ময়লা, ছিন্ন বস্ত্র কখন ব্যবহার কর্বে না, কতে শরীর ও নষ্ট হয়, মনে ও অপবিত্রতা ও নীচতা এবে দেখে।

সদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। পরিষ্কার ও পবিত্রতার জগ্গই স্নান কতে হয়। শাস্ত্রে আছে—
স্নানাহার।

“জল স্নানং মলত্যাগি, তন্মস্নানাবহিঃ শুচিঃ।

মন্ত্র স্নানচ্ছুচিস্তাস্ত জ্ঞান স্নানংপরংপদম্॥”

অর্থাৎ জল স্নানে দেহ পবিত্র হয়, তন্ম স্নানে বাহির পবিত্র অর্থাৎ হিংসা তম প্রভৃতির নাশ হয়, মন্ত্র স্নানে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, আর জ্ঞান স্নানে সেই পরম ব্রহ্মপদ লাভ হয়। দেশের আবহাওয়া বুঝে স্নান কতে হয়। বাংলা দেশে অবগাহন স্নান সকলের পক্ষেই উত্তম। আসল কথা মনের পবিত্রতা আস্মার পবিত্রতা চাই।

শরীরের ক্ষয় পূরণ আর বৃদ্ধির জগ্গই আহারের প্রয়োজন। ভোগের জগ্গ, লালসার জগ্গ যেন না থাকে। যাহা আরামপ্রদ, পবিত্রকাম্বী, বলকারী এমন আহার্য্যই আহার কর্বে। “অন্নজল ব্রহ্ম স্বরূপ।” ব্রহ্ম বলে সদা মনে কর্বে। ব্রহ্ম বস্ত্র কখনো উচ্ছিন্ন, অপবিত্র বা ছুঁলে নষ্ট হয় না। শুধু লক্ষ্য রাখবে উহা পরিষ্কার, টাটকা, স্বাস্থ্যপ্রদ ও পবিত্রভাবে পবিত্র হস্তে তৈরী কি না? নিরামিষ, আহারই উত্তম। ইহা সন্তুণ্ণীর আহার। রজোগুণীরা মাছ মাংসই প্রিয়, আর যারা তমঃগুণী তাঁদের বাণী পঁচা ভাল লাগে। যে বেশ্য বা পাওয়া যায় সে দেশে ত্যাহাই গ্রহণ কর্বে। যতদূর সম্ভব নিরামিষ আহার কর্বে। আর

গেহ, মন্দির, কাগী প্রভৃতি মানুষের নিত্য উপকারী জন্তু প্রাণান্তে-
ও নষ্ট কর্বে না, আহার কর্বে না । বরং যত্নে ওদের পুষ্টবে ।
বিশেষ-গো দেবতার মত উপকারী প্রাণী মানুষের আশ্রয় নাই ।
এমন উপকারী পশুকে দেবতার আশ্রয় যত্ন ও পালন কর্বে, সুখে
থাকতে পার্বে । আর বাহাই গ্রহণ কর্বে অগ্রে তাঁকে, গুরুকে
নিবেদন ক'রে, অর্পণ ক'রে, তাঁর প্রসাদ বলে গ্রহণ কর্বে ।
তাঁর প্রসাদে আর কোন দোষ নাই ।

মাদক দ্রব্য কখনও স্পর্শ কর্বে না । গাঁজা, ভাং, আফিং, মদ
চরম্ থেকে সর্বদা দূরে থাকবে । কলিতে—পাপরূপী কলির চার
স্থানে অধিকার—স্বর্গকার দোকান, অপর বেঞ্চালয় । সুরাপান,
জীবহত্যা, যে যে খানে হয় । স্বর্গকারের দোকান, বেঞ্চালয়,
সুরাপান আর জীবহত্যা, ভ্রম হত্যা এই চার স্থান হতে সর্বদা
দূরে থাকবে । সব নেশা একমাত্র তাঁতেই কর্বে—যাঁর নৈশায়
সারা জগৎ ঘুরছে । অশ্রু নৈশায় কাম কিহে ! তিনিই সর্ব
নৈশাকর ।

বৈদিক ধর্মের পরে ত্রীশ্রীঠাকুরের- কয়েকটি বাণী ।

১। আমাদের ধর্মশাস্ত্র বেদ ।

২। আমরা বৈদিক । পৃথিবীর সমস্ত মানব সম্প্রদায়ই বৈদিক । স্বীকার করুক বা না করুক, কার্য্যতঃ সকলেই বেদ-বেদান্ত মেনে চলছে ।

৩। প্রেম-সেবাই ধর্ম । কাহাকেও কোন প্রকারে কষ্ট না দেওয়াই অহিংসা । অহিংসায়ই উহার জন্ম ।

৪। ভক্ত ও ভগবান্ অভেদ । তুমি, আমি আর এই যে দেখ্ছ, না দেখ্ছ সমস্তই তাঁহাই । সেই অনন্ত সত্ত্ব । সর্বদা সর্বত্র ও তৎ প্রোতভাবে রয়েছেন । এইরূপ উপলব্ধি অবস্থাকেই জ্ঞান বলে । জ্ঞানেই মুক্তি এনে দেয় । মুক্তাবস্থা হতেই প্রেমের ঐশ্বর্য্য । আর প্রেমেরই চরমাবস্থা জীবের চরমোদ্দেশ্য । মহাসমাধি-মহানির্ব্বাণ ।

৫। সর্বদা সংজ্ঞানের সং বিষয়ের আলোচনা করবে । পবিত্র ব্রহ্মভাবের উদয় হবে ।

৬। বীৰ্য্য ও সত্যবান্ হও । বীৰ্য্য ও সত্য স্বরূপই ভগবান্ । ঈশ্বরীক ও মানসিক সকল দিকেই অনন্ত-বল সম্পন্ন হও । অস্ত্র হয়ে জগতে ঈশ্বরের বার্তা প্রচার কর । তেজঃ ও পবিত্রতাই ব্রহ্মের স্বরূপ । তাঁর প্রচারই তাঁর প্রকাশ করা ।

৭। জনাপ্রফুল্ল পবিত্র ভাব রক্ষা কর্বে ।

৮। শাস্ত্র মতে পবিত্রভাবে তাঁর নাম কীর্তন কর্বে ।
বর্তমান যুগে নাম কীর্তন ও সাধুসঙ্গই সমস্ত ধর্মের একমাত্র
সরল ও সোজা পথ । নিরন্তর সাধু সঙ্গ কর । এপথে
পদস্থলনের ভয় নাই । সাধুসঙ্গই মোক্ষধাম-গোলোকবৃন্দাবন ।

৯। ঈশ্বরকে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ ? তাঁকে কোথা ও
খুঁজে পাবে না । কারণ তুমিই যে সেই । প্রতি জীবই যে
তাঁর বিকাশ । অনন্তই তাঁর রূপ । জগতে যা কিছু
সবই তিনি । প্রেম ! অনন্ত প্রেম ! প্রেমময় হয়ে যাও !

১০। মানুষেব সেবাই মানুষের ধর্ম । এ যুগে যে যাহারে
ভক্তি করে সেই-ই তার ঈশ্বর । ভক্তি যোগে সেই-ই তার
স্বয়ং অবতার । হারে মানুষই ত অবতার । প্রতি মানুষই ত
ভগবান্ । এই আমি মানুষ, তোমরা মানুষ, মানুষই ত সব ।
মানুষ মানুষ, মানুষ ! নাস্তি নাস্তি, নেতি নেতি কিরে ? বলা,
ভাবো—অস্তি অস্তি, আছি-আছি ! সত্য, সব সত্য, সব নিত্য
সত্য ।

১১। নিজে মুক্ত, স্বাবলম্বী হও । অশ্রুকেও স্বাবলম্বী
হতে সাহায্য কর । তিতিক্ষা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ভিন্ন কিছুতেই
উন্নতির দিশে যাওয়া যায় না । যত্নে এসব রক্ষা কর্বে ।

১২। সর্বদা কর্ত্ত্ব করে যাও । ফলাফলের দিকে লক্ষ্য
কবে না । লঃভাল্লভ সেই মহাজনের । তুমি তাঁর কার্য্য

হাসিল করে যেতে পারিলেই হোল, আশ্বপ্রসাদ পেলে। আনন্দিই সকল বন্ধনের হেতু। অনাসক্তিই মুক্তি—পূর্ণানন্দ। এখন কৰ্ম কষ্টে কষ্টে জগৎময় হয়ে যাবে, ঈশ্বরময় হয়ে যাবে, প্রেমময় হয়ে যাবে, কেবল তখনই কৰ্ম চল যাবে। এর পূর্বে নয়।

১৩। সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলোকে টেনে নিয়ে তাঁর সেবায় লাগাও, তাঁতে আসক্ত হও। তা হলে আর তারা অন্য পথে যেতে পারবে না। তাঁতেই বাধ্য হয়ে রবে।

১৪। তোমার হৃদয় আসন পবিত্র ভক্তি পুষ্প সাজিয়ে রেখে দাও। তাঁর ইচ্ছা হলে এসে বসবেন। তিনি ত আর কিছুর বাধ্য নন ! তাঁকে কি বাধা করা যায় ! তিনি যে স্বেচ্ছাময় ! তাঁর দয়ীর ওপর নির্ভর করে চলে যাও। তবে পবিত্র স্থান পেলে পবিত্র বস্তু না এসে পারে না। মধু যেখানে মধুকর ও সেইখানে।

১৫। যেমন মাতৃজাতির কৃপা ব্যতীত পুত্র্য, মায়ী হতে মুক্ত হতে পারে না। তদ্রূপ পিতৃজাতির কৃপা ব্যতীতও নারী মোহ হতে মুক্ত হতে পারে না। অতএব পরম্পরের বন্ধন আলগা করে দাও। উভয়ের মধ্যে তাঁর সত্ত্বা জেনে প্রেমে আনন্দে অভিভূত হয়ে যাও। ভগ্নয় হয়ে যাও।

১৬। দরিদ্র, নারায়ণের সেবায়, দেশ-দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ কর, আত্মবলিদান কর। অগ্রে তাঁর আশ্রিত মুক্তি, গুলোর পূজা কর, যেগুলো অস্বাভাব্য বস্তুভাবে মরে যাচ্ছে। শেষে পাষণ্ড মূর্তি দেখিও। মানুষই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক।

১৭। গোলমাল করো না। ঈশ-মুশা বল, আল্লা বুদ্ধ-ইরিকৃষ্ণ হলো, যে যাই বলে ডাক, যেই ভাব—ভাবো, সবইত এক। তাঁর রূপইত সর্ব্ব ঘটে। তবে ভাবার-ডাকার কায়দা আছে। যার নিকট যে ভাব, যে আদর্শ, যে নাম, যে রূপ যত নিকটে, যত পরিচিত, তার সেই নামে সেই রূপে নির্ণা তত শীঘ্র ও সহজে এসে থাকে। তাই, নিকট হতে ক্রমশঃ দূর দূর প্রবর্তন কর্তে হবে। তাঁর প্রকাশের যে, যেদিক ধরে, যেভাবে সহর মিশ্রতে পারে, সে তাই করুক। যতজন, তত মন; যত মত, তত পথ, কারূ পথে কেউ যেতে পারবে না। যার যার পথে সেই সেইই যাবে। তাই পরস্পরকে সাহায্য করো। পথ এগিয়ে-পথ শেষে, শেষস্থানে মিলে—একত্রে মিলেই সব সন্দেহ, সব বিভিন্নতা, সব ভ্রামসা ঘুচে যাবে। দেখবে—একই পথ, একই সব।

১৮। একলব্য মেটে দ্রোণে ভক্তি ক'রে তাঁর নিকট হ'তে বাণ শিক্ষা করেছিল। আর তোমরা এই তাঁর জ্যাম্ব—অনন্ত মূর্তির ভিতর তাঁর দর্শন পাবে না? বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর। সবইত সেই এক। লীলায় বিভিন্ন রং-ফলান মাত্র।

১৯। সর্ব্বাঙ্গে বুদ্ধ, শিশু ও নারীদের সাহায্য করবে। অতিথি ও অভ্যাগতকে সমস্ত আহার ও বাসস্থান দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। দীন-দরিদ্র, মূর্থ, আর্ন্ত আতুর, নিঃসহায়, নিরাশ্রয়, নির্যাতিত ও দুর্ব্বলকে সর্ব্বদা রক্ষা করবে, তাদের যথাযথ উদ্ধার করবে। আর সর্ব্বদা সরল, বিনয়, গান্ধীর্ষ্য ও আত্ম-মর্যাদা-রক্ষার চর্চা চলেবে।

২০। মদ-গাঁজা, আফিং ভাং প্রভৃতি মাদক-নেশাকর জুবাঁ চিরকালের জুহু ত্যাগ কর্বে। ভুলে ও উহা স্পর্শ কর্বে না। নেশা একমাত্র তাঁতেই কর্বে। তিনিই সর্ববনেশার আধার।

২১। যে সকল প্রাণী সকলের বিশেষ উপকারী যেমন গো, অশ্ব, মহিষ, ছাগী ইত্যাদি, তাদের কখনো হত্যা কর্বে না। ওতে জগৎত্বের মহা অনিষ্ট করা হবে। তাদের যত্নের সহিত পরিচর্যা কর্বে।

২২। স্বাধীনভাবে পবিত্রস্থানে উপবেশন ক'রে চিত্ত-প্রশান্তকারী পবিত্র ও শরীরের উপাদেয় খাদ্য খাবে। যে কাজই কর্বে তাঁকে শরণ নিয়ে, তাঁর হয়ে তাঁকে অর্পণ ক'রে কর্বে। দেশকাল ও পাত্র উপযোগী অনাড়ম্বর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যবহার কর্বে। স্বদেশ জাত দ্রব্য সমূহই ব্যবহার কর্বে। দেব-গুরু পূজায় লাগাবে।

২৩। শুধু পাঠশালাই মানবের শিক্ষা মন্দির নয়। এই সারা জগৎটাই জীবের প্রকৃত শিক্ষা মন্দির। দেশ বিদেশে ভ্রমণ কর, ঘুর, কন্স কর, করে প্ররথ কর, শেখো। গভীর স্থির ও ধৈর্যশীল হও। এক একটা বিষয় নিয়ে এক একটা জীবন কাটিয়ে দাও।

২৪। নানা দেবদেবীর গুণে জালাভ কি হে? কে কোন এক প্রতীকের সাধনা ক'রে, সেই প্রতীকে জগৎত্বের সকল দেবদেবীর ভিতর, সকলের ভিতর, সকল বস্তুর ভিতর বিস্তার ক'রে হরেক রূপে তাঁর সাক্ষাৎ প্রতীকের সেবায় জুগুপ্সা কর।

২৫। ভগবান্ কি এতই তুচ্ছ বস্তুরে ? যে তাকে চাকরের দ্বারা আহ্বান করবে ? তার দ্বারা পূজা দেবে ? নৈবেদ্য দেবে ? আর তাতে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করবে ? সে কি অত অনাদরের ? সে যে প্রাণের জিনিষ। সে শুধু প্রাণ চায়, সরলতা চায়, বিশ্বাস-ভক্তি-ভালবাসা চায়। সে তোদের বড় মানুষের ধার ধারে না। সে যে সকলের বড়। যে তাকে প্রাণের সহিত ডাকে, সেইই পায়। তাঁর পূজা, তাঁর সেবা কষ্টে হয়ত নিজে নিজে কর। নিজহস্তে ফুল বিল্বদলে আত্ম-নিবেদন ক'রে কর। কি দুঃখের বিষয়, লজ্জাব বিষয় যে, হিন্দু জাতি ধর্ম ও এমন পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে, তাঁর পূজা তাঁর সেবা অন্যে না করে দিলে হয় না ? মানুষ হস্তু আগে স্বাবলম্বী হ', ভিতরে বীরত্ব আন, শক্তিকে জাগায়ে তোল, তবে ধর্ম কষ্টে পার্বিব, সবই কষ্টে পার্বিব। সে যে অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম-স্বরূপ ! সত্য-ব্রহ্ম-বন্ধু ! ওঁ সচ্চিদানন্দ ! ওঁ হ্রাম্।

বিবিধ উপদেশ ।

তঁার কৃপা না হলে বহুশত্রু আলোচনা, কি কঠোর তৃপস্যাদি ভগবৎ কৃপা । কল্পে ও তাঁকে পাওয়া যায় না, জানা যায় না । তঁার দয়া ভিন্ন কেউ সেই আত্মরূপতীর্থে স্নান কর্তে পারে না । যখন তঁার বিন্দু কৃপাদৃষ্টি হয় তখন আপনা হতেই সব প্রকাশ হয়ে যায় । তাঁকে কি ডেকে ডুকে বাধ্য করা যায় ! তিনি ঘেঁষেছাময় ।

তঁার দয়া সকলের'পরই সমান । তবে বৃষ্টি যেমন সব জায়গায়ই বর্ষণ হয়, কিন্তু জল জমে থাকে গিয়ে যেখানে নীচু, দাঁড়াবার স্থান আছে সেইখানে । ঘরের মটকায় কি পাহাড়ের চূড়ায় ঝাঁড়ায় না । গড়িয়ে গিয়ে কুয়ায়, হ্রদে পড়ে । তদ্রূপ তঁার দয়া ও সকলেরই সমান হলে ও সে দয়া রাখবার ভাণ্ড যার আছে, যে ভক্তিভাবে নত হয়ে নীচু হয়ে রয়েছে তার'পরই প্রকাশ পায় । অহঙ্কারী পাপী যাবু, আমার দেখা পায় না তারা । সে যে ভক্তেরই ভগবান !

‘সূর্য্য’ সব জায়গায়ই, সব বস্তুর ওপরই সমভাবে কিরণ দিচ্ছে । সকলেই ওতে শান্তি পাচ্ছে, কিন্তু যে প্রবল সান্নিপাতিক বিকারে ভুগুচ্ছে তার ও কিরণ সহ্য পাবে কেন ? সে যদি তেজের জ্বলে ঘরের কোণে গিয়ে লুকায়ে সূর্য্যের নিন্দা করে । সূর্য্যের কি দোষ ? তোমারই যে দুর্বলতা । তুমি

তোমার নিম্নের দোষে খেতে পাওনা, পুর্তে পাওনা, রোগ যন্ত্রনায় ভোগ, একি ঈশ্বরের দোষ ? একি দৈব বিড়ম্বনা ? তুমি না জন্মিতাই তিনি তোমার সর্ববিধ সুখের সামগ্রী অগতে তৈরী করে রেখে দিয়েছেন । চিনে নাও না । তিনি সর্বদাই দয়াময় । দয়া বিতরণের জন্য সदाই হস্ত প্রদারণ করে আছেন । তোমরা নেও, চেয়ে নেও, নেওয়ার উপযুক্ত হয় । তাঁর দয়া রাখবার পাত্র কর ।

তাঁর দয়ার ওপর বিশ্বাস রেখে তাঁতে সব সমর্পণ ক'রে, গা ভাসা দিয়ে চলে যাও । সব তিনি করে নেবেন । তিনি প্রহ্লাদকে অগ্নির কুণ্ডে রক্ষা করেছিলেন, দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন, এখনো তিনি সকলকে রক্ষা করছেন, সকলের পর দয়া বর্ষণ করছেন । ধরে নেও, রাখ ।

ভূত ভবিষ্যৎ কিরে ? বর্তমান ! বর্তমানে বর্তমানের কার্য্য বর্তমান । করে যাও । যা হয়ে গেছে তা গেছে, যা হবে তা হবে কি না হবে তার নিশ্চয়তা কি ? স্বর্গ নরক, সুখ দুঃখ, পরিণাম, অপরিণাম সবই এই বর্তমানে । বর্তমানেই সব ভোগ করে যেতে হবে । করে যেতে হবেন তবে ভবিষ্যতের জন্য এইটুকু মাত্র দেখবে যে, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কোন দুঃখ-কষ্ট-কোন অসুবিধার দাগ না রেখে যাও ।

দীন দরিদ্র, মূর্থ, আর্ন্ত আত্মার দুঃখ কেউ বুঝলে নারে ।
একই ভাষা । গুরু পুরুত, জমিদার তশীলদার আর ক্ষুদ্র ধোরে
দল-শুধু জোড়ের মত শুড়-শুড় কষ্ট এদের রক্তই চেষ্টে খেয়ে

খেয়ে দেশটাকে একেবারে কাঙ্গাল করে ফেলায়ছে। এরা গৃধ্রীণীর চেয়েও হারাম! নিমকহারাম! তোরা একবার ভাব দেখি, একটু ভাব! ভেবে দেখ, কোথায় কোন্ হালে তোরা আছিস্। ছুনিয়া বা কোন্ হালে চলছে। আর ধনী মানী তোমাদেরও, বলি, তোমরা ও একটু ভাবো, ভেবে দেখ আর কতকাল পায়ের উপর পা রেখে চলবে? শীঘ্র এর প্রত্যেক কর, নতুবা যে যুগ চক্র ফেরছে, এতে যেমন উচ্ছেদ আছে, তেমন আবার নীচে পড়ে যাবে। এষে জাগরণ যুগ। সকলেই জাগবে। তাই শীঘ্র করে ছুনিয়ার সব তন্ন তন্ন করে দেখ, দেখে কর্ম পন্থা নির্দেশ করে লও, চলো।

গরীব গরীব, ধর্ম ধর্ম বলে চেঁচামিচি কেন হে? কর্মে নেমে পড়। পরের পর নির্ভর করে কেউ একমুষ্টি অন্ন যা একটুকরা ছিন্নবস্ত্রও ব্যবহার করবে না। প্রাণ ত একদিন যাবেই। যাক না, তবু স্বাধীন ভাবে যত দিন বাঁচা যায় বাঁচো। মনে প্রাণে ভাবো আমি স্বাবলম্বী আমার কোন অভাব নাই। জগতের প্রত্যেক জীবজন্তুই যখন স্বাধীন, তখন আমি পরের অধীনতা স্বীকার করে বাঁচবো কেন! আর কার্যে ও উছা পরিণত কর। হ্যারে, আমারে শুধু ভগবান্ ভগবান্ বলে লাভ কি? আমিও এই যেমন মানুষ, তোরাও তেমনই মানুষ। মানুষ বৈ ছুনিয়ায় কিছুই নাই। মানুষের মধ্য দিয়াই সব হয়।

আমার ভক্ত যে হবি, সে আমার মত শক্ত হবি, যে ভা
না পার্বি, সে শুধু কুঁড়ে মানুষের মত বসে বসে ঠাকুর,
ভগবান্ ভগবান্ ব'লে আমার নামের—আমার দীনবন্ধ
নামের কলঙ্ক করিস না ।

এই যে তোমরা আমাকে, এই দেহটার মধ্যেই মাত্র
বিরাটের পূজা কর । আমাকে জেনে ভক্তি ভালবাসা জানাচ্ছ,
এভক্তি আমাতে খাটী খাটী ভক্তে
পৌঁছাচ্ছেনা, আমি ত আর এতটুকু নই ! আমি যে বিবাট,
অনন্তরূপী-অনন্ত বিশ্বময় বিশ্বস্তর ! এই যে আমার এতটুকুকে
ভালবাসছ, এরপর একে যে যে ভালবাসে, তাদের ভালবাস,
তোমার স্বপরিবারের মধ্যে আমি আছি জেনে, আর তারা
তোমাকে ভালবাসে তাই তুমিও তাদের ভালবাস । এইরূপে
স্ব-গ্রামবাসীকে, স্বমতাবলম্বীকে, স্বদেশবাসীকে, পরে এইরূপে
এই জম্বুদ্বীপবাসী এই জগৎবাসী সকলের মধ্যেই তাঁহার
প্রকাশ—তাঁহার সত্ত্ব । জেনে ভালবাস, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির
পূজা কর । তবেই তাঁহার খাটী খাটী পূজা হবে ।

একবার ঠাকুর কোলকাতা হাটে ট্রেনে আসছেন, পথে
য-ভাব সহসা ছাড়ে গাড়ীর শব্দ শুনে একদল শূকর দৌড়ে
না ।

জঙ্গলের মধ্যে গেল । আর তার সঙ্গে সঙ্গে
কাওয়ারী (শূকর পালক) হুড়মুড়িয়ে ঢুকল সেই জঙ্গলের মধ্যে ।
তা দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর কেমন হুঁয়ে গেলেন ! চীৎকার করে
কেবলই বলতে লাগলেন—“দেখ—শূকরের পিছে কাওরা

দোঁড়ায়, শূকরের গিছে কাওরা দোঁড়ায়।” চীৎকার শুনেত
বহুলোক জড় হোল। এক ভদ্রলোক বলে—“মহাশয়, শূকরের
পেছন ত কাওরা দোঁড়ায়েই থাকে, তা আপ্নি ওরূপ বলছেন
কেন?” তখন একটু প্রকৃতপ্ন হয়ে বলেন—“শূকরের পেছন যে
কাওরা দোঁড়ায়, তা আমি জানি। কিন্তু এই দুনিয়ার সব কাওরা
হ’য়ে ঐ সংসারের কামিনী কাকনরূপ শূকরের পেছনে পেছনে
দোঁড়াচ্ছে। ঠাঁহার দিকে একবারও কেউ ফিরে চাচ্ছে না।
এমন যে কত কত সোণার মানুষ সব জীবের জন্ত এসে, তাদের
ডেকে ডেকে চলে যাচ্ছে কেউ যে ফিরেও দেখে না।
যার যা স্বভাব তা সহসা সে ছাড়তে পাচ্ছে না। এই যে সুন্দর
গাড়ী যাচ্ছে, কত দেশ বিদেশের কত লোক যাচ্ছে, তা না দেখে
ওরা দোঁড়ালো ঐ কাঁটা বনে শূকরের পেছন। এক পলকও ফিরে
চাইলে না। বাঁশী বাজাটা ও বুঝি ওদের কাণে পৌঁছাল না!
তিনি যে ধরা দ্বিবার জন্তই যুরে যুরে বেড়াচ্ছেন, কেউ তাঁকে
ধরে না। চিন্তে না।” খ্রীষ্টীঠাকুরের ভাব বুঝে যাত্রীরা তখন
ধর্ম বিষয়ে অনা কথা শুনতে চাওয়ায় ঠাকুর বলতে লাগলেন—
দেখো, যে যা ধরে আছে, যে রত্ন ডুবে আছে, অতি বিবাক্ত হলেও
তা তাঁগ কষ্টে সহ্য চায় না। মাতালেরা যেমন প্রথম প্রথম
সখ করে মদ খায়, শেষে খেতে খেতে মদে এমনই আসক্ত হয়ে
পড়ে যে, সর্বদা সেজন্ত বিক্রীত হ’য়ে গেলে ও আর ছাড়তে
পারে না, চায় না। তদ্রূপ এই সংসারের জীবগণ প্রথম প্রথম
সখ করে সংসারে প্রবেশ করে, কিন্তু শেষে আর তা ছাড়তে

পারে না। কামিনী কাখনে এমনই আসক্ত হয়ে পড়ে যে, ঠোঁট ছাড়াতে চেষ্টা করে ও, বুকে নিজের ছাড়ুতে ইচ্ছা বলেও অভ্যাসের দোষে আর ছাড়ুতে পারে না। ছেড়ে যাবে কোথায় ? ধর্কের কি ? একটা চাইত ? এই যে পূর্বে এবেশে সতীতাহ প্রথা ছিল, স্বামী মরলে তার স্ত্রীকে জোর করে জীবন্ত ধরে আগুনের মধ্যে দিয়ে পুড়িয়ে মারত, তা না করে তখনকার ধর্ম থাকত না। মহাত্মা রামমোহন রায় এপ্রথা উঠাবার জন্য কত চেষ্টা করেন, পারেন না, শেষে যাই রাজশক্তির আশ্রয় নিলেন, অম্মি রাজার আইন বলে দু'দিনের মধ্যে ও কুপ্রথা উঠে গেল, এসব সামাজিক কুপ্রথা উঠান রাজ আইন ভিন্ন ভারী কষ্ট।

একদিন পথে দেখি এক বৃদ্ধ জমির আবর্জনার ধূলা সংসার ও সাধনা। বাড়ছে। ধূলায় তার সর্ববীজ ছেয়ে কাল মামুষ একেবারে সাদা করে ফেলেছে। নিকটে যেতেই এসে প্রশ্ন ক'রে দাঁড়ালে। গায়ে হাত দিয়ে বল্লম—এসব কি ? সন্ধ্যার সময়, কেমন ক'রে কতক্ষণে এসব ছাপ্ ক'বে ? বৃদ্ধ হেসে নদী দেখায়ে বল্লম—“ঐ যে রয়েছে, সারাদিনের শুলো দিনান্তে একবার বাপ্ দিলেই সব সাক্ হয়ে যাবে।” শুনে বড় আনন্দ পেলাম। এই আমি তোমাদের সাহি। ভয় কি ? সারাদিনের সারা সপ্তাহ—মাসের সংসার জমির ময়লা—আবর্জনা লাগাও, ক্ষতি কি ? দিনান্তে, মাসান্তে ও যদি একবার ঐতে বাপারে পড়ে, আমার নাম উচ্চারণ কর, আমার সব পাপপুণ্য শোক তাপ স'পে দাঁও, নিমেষে সব ঐরূপ সাক্ হয়ে যাবে। আমি

তোমাদের সব গ্রহণ কল্পেম, সংসারী সংসার ত্যাগ কর্বে কেন ? ৭ দিনের কাজ ৬ দিনে সেরে একদিন আমার নিকট এসো, এই সাধু সঙ্গে এসে, ব'সো, একমাসের কাজ ২৫ দিনে সেরে, ৫ দিনও যদি এসে থাকো, তাতেই সব হয়ে যাবে। সব ময়লা মাটি ধুয়ে যাবে। নিষ্পন্ন পবিত্র হয়ে যাবে। সংসার ত্যাগ কন্তে হবে না। খুব খেটো, খাটুনিতে থাকলে মন পবিত্র থাকে, আশ্রয় ভাল থাকে। আমার নাম কর্বে, আর কাজ কর্বে। যার যার আমার এ মুক্তির একবার একটুকুও দর্শন হয়েছে, অন্তিম তাদের প্রত্যেকেরই মুক্তি জান্বে। ভয় নাই! মাঠে:। অতী হয়ে নিরন্তর কর্ম কর, আর আমার নাম কর, শরণ মনন কর, আমি তোমাদেরই আছি।

হারে, তোরা ত আমায় চাস্, আমার প্রেম ভালবাসা, দয়া বসবার মত আসন চাস্, কিন্তু শুধু চাইলেই ত সে ধন আর না দিয়ে বসতে বসেও দেওয়া যায় না। আমি তোদের দেওয়ার জগুই হস্ত উত্তোলন ক'রে সদা দাঁড়ায়ে আছি। কিন্তু দেবো কোথায়? দেবো কাকে? এপ্রেম, থোব কোথায়? তোরা আমায় রাখ'বি কোথায় কলত? যে বৃকে স্ত্রীকে নিয়ে কাম চরিতার্থ করিস্, ঙ্গান্ সাহসে সেই বৃকে এ অমূল্য ধন রাখতে চাস্? কিন্তু তবু আমি যেয়ে থাকি। কিন্তু বড়ই কষ্ট হয় বেশীক্ষণ থাকতে পারি না। অসহ্য হয়ে চলে আসি। আমি তোদের চাইই। কিন্তু তোরা ও আমাকে একটু চা। সৎ হ, জিতেন্দ্রিয় হ, হৃদয় আসন পবিত্র ক'রে বসে থাক, না ডাকলে ও

আমি গিয়ে যসুখে । বসবার মতন আসন না হ'লে বসতে ব'ল্লেও কি কেউ বসে ? হৃদয় আসন পবিত্র কর । যেখানে পবিত্র— সেইখানেই আমার বাস । তোরা সৎ হ, পবিত্র হ, তোদের সকলের চৈতন্য হোক । ওমা—। (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব সমাধি)

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কোন রোগীর রোগের ব্যবস্থা করে দিতেন, রবিবার । তখন বলতেন—রবিবার পবিত্র দিন । এদিনে বাড়ীতে কেহ কখন মাছ মাংস খাবে না । ঘর দোর লেপে পুছে কাপড় চোপড় ধুয়ে টুয়ে পরিষ্কার হয়ে থাকবে ! আর যতদূর পার সংযমী হয়ে আমার শরণ মনন করবে । এভাবে চল্লে অগ্নিভয়, সর্পভয়, অকাল মৃত্যুভয়, জলের ভয়, কোন পৈশাচিক ব্যাধির ভয়, কোন ভয়ই থাকবে না । আর সক্ষম হলে সাধ্যমত সাধুদের সেবা করবে, তাদের নিয়ে নাম করবে, সদ বিষয়ের আলোচনা করবে, এতে সর্বত্র মঙ্গল হবে ।

মতে থেকো, মতে থাকা ভাল । রাখালের হাতে বা বাঁধা মতে থেকো, মতে গোছড়ে গরু যেমন সতর্ক না হয়ে পারে না, থাকা ভাল । ফসলের লোভে দৌড় দিলেও খুঁটোয় টান লেগে কি রাখালের সাবধানতায় গোচরে কিরে আস্তে বাঁধা থাকে, তদ্রূপ যে কোন সাধু, মহাপুরুষ, সদগুরু কথ্য মেনে চল্লে, তাঁর ভাব বা মত মতন চল্তে বাঁধা থাক্লেও পাপ কার্য্য হতে—ঐ সাধুর দয়া হতে বঞ্চিত হবার ভয়ে মন কিরে আসে । অত্যাঁয় কাজ ক'লে প্রভু অসন্তুষ্ট হবেন, তিনি আর ভাল বাসবেন না, তাই নাগা প্রকারের প্রলোভনে পড়্লে ও গুরুর কথা স্মরণ

হওয়া মাত্রই মনের গতি ফিরে যায় । সে আর অন্তায় কতে পারেন না । প্রত্যেকের জীবনই এক এক জনের পর নির্ভর করে থাকা ভাল । আনন্দে থাকা যায় । সমস্তই তিনি নিয়েছেন, সমস্তই তাঁকে দিয়েছি । আমার আবার ভয় কি ? অন্তায় করি চূলে ধরে টেনে ফিরাবেন । যা করবার তিনিই করবেন ! আমার শুধু জোর দিতে হবে । একজনের পদে জীবন সপে দাও । জন্মের মত সপে দাও, আর ফিরে উঠায়ে না । জীবনের একটা লক্ষ্য একটা স্থিরতা না থাকলে তার দ্বারা কোন কার্যই সম্পন্ন হয় না ।

শক্তি অর্জন কর । শক্তিই সমস্ত বাধা বিঘ্নের উপরে শক্তি অর্জন কর । কার্য্যকরী, শক্তির জয় অবশ্যস্তাবী । কষ্টেই শক্তি উপার্জিত হয় । কষ্টই ধর্ম্ম । কর্তব্য কষ্টই ধর্ম্ম কষ্ট ।

কষ্টের মধ্যে কখনো উদ্বেগ এনে না । কষ্ট করে যেতে, হলে অসীম ধৈর্য্যশীল হতে হয়, নিখুঁত চরিত্রবলে বলীয়ান হতে হয় । চরিত্রবলের মতন আর বল নাইরে ।

আরও কার্য্যের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ডুবায়ে রাখতে পাল্টেই শত বাধা বিঘ্ন, শত দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়াও সকলতা এসে যায়ই । আর জানবে—কর্ম্ম আরম্ভ কলেই সঙ্গে সঙ্গে শক্তি ও সুবিধা এসে থাকে ।

বিনা রক্তপাতে জগজ্জয় কতে হলে একমাত্র ভালবাসাই প্রকৃত জগজ্জয়ী বীর । তার প্রমাণ অস্ত্র জানবে ! যে বিশ্বপ্রেমিক সেইই মহাযোদ্ধা, সেইই প্রকৃত জগজ্জয়ীবীর ।

‘ভিক্ষা করা নিন্দনীয় কখন : যখন উহা নিজের জন্ত, নিজের ভিক্ষা করা নিন্দনীয় উদর পূর্তির জন্ত করা হয়। আর যখন দেশ কখন ? দেশের, গরীব দুঃখীর জন্ত অন্ধ আতুরের জন্ত করা হয়, তখন ওতে মহাপুণ্য হয়। হৃদয়ের প্রশস্ততা বেড়ে যায়। প্রেম আসে, মুক্তভাব আসে। আর জানবে—ভিক্ষা বিমা জগতে কখন কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না।’

তঁার নিকট কিছুই চেয়ো না, প্রার্থনা করো না। চাইলে প্রার্থনা। একমাত্র তাঁকেই চাবে। আর যদি কিছু চাবেই তবে এইরূপ ভাবে চাবে :—

“হে প্রভু ! তোমার মহিমা জয়যুক্ত হোক ! আমায় সুখে, কি দুঃখে রাখো তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমাকে যেন কখনো ভুলিয়া না যাই। আমার সমস্ত চেষ্টা যেন তোমার কার্য্যেই নিয়োজিত হয়। আমাতে যেন তোমার সবা প্রকাশিত হয়। তোমার প্রেমপূর্ণ পবিত্রোজ্জ্বল শ্রীমূর্ত্তি যেন নিয়তই আমার নয়নদ্বয়ে উদ্ভাসিত থাকে। আমি যেন সদা তন্ময় হয়ে যাই, তন্ময় হয়ে রই।

হে প্রভু ! আমার ইন্দ্রিয় নিচয়ে বাহা বাহা অনুভূতি আসে, তাহা যেন তোমার দ্যুতির মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হয়ে আসে ! হে প্রভু ! হে আমার প্রাণের বন্ধু ! আমি আর কিছুই চাই না, আর কিছুই আমার কামনা নাই, শুধু এই কর প্রভু ! তোমার ভক্তগণের দুঃখনোনাশ পূর্ণ কর, সকলকেই মুক্ত কর !

হে প্রেমময় ! তোমার অহৈতুকী পবিত্র প্রেমে সকলকে শুদ্ধ
আমাকে জন্মের মত—চিরদিনের জন্ত ডুকায়ে রাখ ! হে বন্ধু !
হে প্রভু ! তাহাই কর, তাহাই কর, ওম্—ওম্—ওম্— !
(শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব সমাধি) ।

পরিশিষ্ট (ক) ।

শ্রীশ্রীদীনবন্ধু প্রণাম ।

বুড়ুকার্ত্তং নিরাশ্রয়ং নির্ঘাতীতং,
বন্ধুং মূৰ্খং এবং ষড়্ ভাবম্ দীনম্ ।

তস্মৈ বন্ধুং যঃ স পরং ভগবানম

দীনবন্ধুং প্রণমামি মুহুমুহুঃ ॥

নির্ঘাতীত নিরাশ্রয় আর জ্ঞানহীন,

ক্ষুধার্ত্ত ও বন্ধু আৰ্ত্ত এই ষড়্ দীন ।

এ দীনের বন্ধু যিনি পরম আশ্রয়,

(সেই) ভগবান দীনবন্ধু প্রণমি তোমায় ॥

শ্রীশ্রীদীনবন্ধু স্মরণ স্তোত্রাষ্টকম্ ।

মীনটো বাহমং যস্য নুরচিত্তং তথাসনং ,

মার্জিব শাস্ত্র ব্যৱিধৌ নিত্তরাং প্লবতে সদাই ।”

নরনাগং মঙ্গলার্থকং নরেষু যঃ প্রকাশতে

শ্রীদীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥১৯॥

পূজোপকরণং যস্য শ্রদ্ধার্থ ভক্তি চন্দনং

শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি ধারিণং জ্ঞানময়মকল্যাণং

কৃপয়া জ্ঞান হারিণং নমাম্যাহ বিভূতয়ে

শ্রীদীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥২০॥

ভক্ত মণ্ডল মণ্ডিতং দীনার্ভ কল্যাণে রতং

কীর্তনে কথনে চৈব নৃত্যস্তমকুতো ভয়ং

জগন্মঙ্গল মান্দ্ৰল্যং নমাম্যাহ বিভূতয়ে

শ্রীদীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥২১॥

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশেষু জগতঃ সর্বকারণং

অচিন্ত্যাব্যাক্ত দেহক ব্রহ্মবীজ স্বরূপকং

বাক্যাতীতং ত্রিকালজ্ঞং নমাম্যাহ বিভূতয়ে

শ্রীদীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥২২॥

অচলঃ সচলো ভাতি চৈতন্যং লভতে জড়ঃ

যৎ কৃপালেশ মাত্রেণ পঙ্গুলজ্জয়তে গিরিঃ

স দীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥২৩॥

অশান্তঃ শান্তিমাপ্নোতি ক্রমো ভবতি সুস্থকঃ

যৎ কৃপালেশ মাত্রেণ মুকো বদতি ভাসিতং

স দীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥২৪॥

অজ্ঞো ভবতি জ্ঞানো চ বন্ধো মুক্তো মহীতলে

যৎ কৃপালেশ মাত্রেণ স্ননাথঃ সনাথয়েতে

স দীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥৭॥ ১

দীনো ধনী হিতো দন্যুঃ সুখী ভবতি পাণ্ডাং ।

অসাধুঃ সাধুতা মোতি যৎ কৃপালেশ কারণাৎ

স দীনবন্ধুঃ সততং ভবিতা শরণং মম ॥৮॥

পরিশিষ্ট (খ) ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ।

যাঁহার পুণ্যাবিভাবে অস্পৃগু অশিক্ষিত ও চিরনিদ্রিত জন সাধারণ যুগ-যুগান্তরের জাড্যতা-দাস্যতা পরিহার করতঃ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, যাঁহার বুদ্ধের ন্যায় জ্ঞান, যৌশুখ্যের ন্যায় প্রেম, রামকৃষ্ণের ন্যায় সরল কথায় শাস্ত্র মৌমাংসা ও নেপোলিয়ানের ন্যায় কৰ্ম্ম তৎপরতা দর্শন করিয়া বঙ্গের ভদ্রাভদ্র বহু নরনারী স্তুতি ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন; যিনি সাম্য—মৈত্রী—স্বাধীনতা ও অভয় অতীঃ বার্তা লইয়া দেশে দেশে ঘরে ঘরে মহামিলনের অকুরন্ত অনিবার্য—অনাবিল প্রেমস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন; দীন-দরিদ্র, আর্ন্ত আতুর জনরাজ্য নির্যাতিতের মধ্যেই ভগবানের মূর্ত্যভাবে সৰ্ব্ব প্রকাশ, ইহা প্রত্যক্ষ করাইয়া বহুমূর্তিতে

গণ-সারসংগে সেবা করিয়া ধন্য হইতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—
সেই সান্ত্বমানব শরীরে অনন্ত মহাশক্তির বিকাশ, মহামানব
অবতার পুরুষই দীনহীন কান্ডালের বেশে অপূর্ব তেজঃবীৰ্য্য ও
মহাপবিত্রোজ্জ্বল প্রেমমূর্তিতে প্রেমের পাগল শ্রীশ্রীদীনবন্ধু নামে
সুপ্রকাশ হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বাটুলচন্দ্র
ঠাকুর, মাতার নাম পান্নাময়ী দেবী। জন্মভূমি—ফরিদপুরের
অন্তর্গত দেবাসুর গ্রাম। জন্মকাল—১২৮৯ বঙ্গাব্দের ১১ই
ভাদ্র বুধবার, কৃষ্ণাষ্টমী, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত।

ধন্য ভারতবর্ষে সেই পুণ্যোৎসব দিবস,—ভাদ্রের সেই পুণ্য
মুহূর্ত, ভক্তরাজ বাটুলচন্দ্রের জন্মাষ্টমী মহোৎসব, আর ধন্য
পরম ভাগবত গায়ক কবি আনন্দচন্দ্র সরকারের পবিত্র রাম
নাম কীর্তনের সেই পবিত্র উচ্ছ্বাস! রাত্রি প্রভাত হইয়া
আসিতেছে, শারদীয় শিককুল আনন্দে কুঁহু দিতেছে, হংস
হংসীবা উচ্চৈঃস্বরে হংস মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে, পূর্বাকাশ
'ক্রমশঃ'ই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে, জগতের 'জীবগণ
মলয়ের হাওয়ায় প্রাণের আরামে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে,
পবিত্র ওম্কার উপগীতিতে নভোবিশ্বলে অপূর্ব ধ্বনি শ্রবিত হইয়া
সকলকেই স্বর্গীয় দিবাভাবে বিভোঁবা করিয়া দিতেছে, আনন্দে
আত্ম-হারা হইয়া আনন্দ-চন্দ্র ধূয়া দিয়াছেন—“কোথায় রহিলে
দয়াল দীনবন্ধু রাম!” আর অমহি অমদর মহল হইতে মঙ্গল-
ধ্বনি লক্ষ্যকাংশ সহ হলুধ্বনি উঠিল! অঙ্গলের মধ্যে জগন্নাথের
আবির্ভাব জ্ঞাপিয়া ঐ অবস্থায়ই আনন্দচন্দ্র আঁতুর্ভঞ্জে প্রবেশ

করিয়া পান্নাময়ীকে বলিলেন—“মা কি পেয়েছ? একবার দেখাও দেখি, দেখে জীবন সফল করি।” বলিয়াই তিনি সন্তুষ্ট জাত শিশুকে কোলে লইলেন, এবং বলিলেন—“মা এ যে আমার দীনবন্ধু এসেছে, এ যে এবার দীনগণের বন্ধু হয়েই এসেছে, এবার এ'র নাম দীনবন্ধু।” বলিয়া আবার সন্তায় ফিরিয়া গেলেন, এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের গুণাবলী ও ভবিষ্যৎ কার্যাবলীই কীর্তন করিয়া তাঁহার আবির্ভাব বার্তা প্রথম জগতে প্রচার করিলেন। এইরূপেই এ ভাব রাজ্যের সোণার মানুষ, ভক্তের ন'দের গোরা, সদাপ্রফুল্ল প্রেমময় শ্রীশ্রীদীনবন্ধুর জন্মোৎসব সম্পন্ন হইল।

দেখা যায় যে সকল মহাপুরুষ জগতে ওলটপালট পরিবর্তন আনিয়া, যুগে যুগে অশান্ত জগতে শান্ত ভাব প্রদান করিতে আসিয়া থাকেন, বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের ভাব সাধারণ মানবের হইতে সর্বপ্রকারে অসাধারণ বৈচিত্র্য-রকমের। এই জন্যই তাঁহাদের পাগল, লেংটা, ক্ষেপা প্রভৃতি উপাধিই শিরোভূষণ হইয়া থাকে। আর কালে উহাই সকলের প্রিয়, সকলের আত্মরে নাম হইয়া থাকে। এ অন্তত ভাবের মানুষেই বা তাহার বিপর্যায় হইবে কেন? হিংস্র সর্প, কুহুর লইয়া খেলা, ঠাকুর দেবতা লইয়া ঠাকুর সাজিয়া খেলা, সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা হয় দিব্য দৃষ্টিতে তাহাকেই পূজ্য জ্ঞানি সন্মান, প্রদর্শন করা এবং সাধুদল দৃষ্টিতে যেই মায়া দিব্য দৃষ্টিতে তাহাকেই নির্মল জ্ঞানিয়া অবজ্ঞা করণ, কাহারও স্পর্শ মাত্র

য়েগে শাস্তি, কাহারও বা দর্শন মাত্র সদ্যমুক্তি । কতরূপে
কৃত ভাবে কৃত ভাবের খেলাই এ ভাবের মানুষ খেলিয়া
গেলেন !

তাঁহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পূর্ণ স্ফুটন প্রেমমূর্তি, কমনীয়
ভাব কাস্তি, বিশ্ব বিমোহন বাঁকা অরুণ আঁখিদ্বয় যেই ই এক-
বার দর্শন করিত, সেই ই মুগ্ধ হইয়া যাইত । হারানিধি, প্রাণের
রতন পাইয়া প্রাণে তুলিয়া লইত ! যথার্থ ই শ্রীশ্রীঠাকুর এবার
বন্ধুভাবেই আসিয়াছিলেন । এমন চিত্তাকর্ষক মূর্তি, এমন সর্বস্ব-
হরণকারী অহৈতুকী প্রেমভাব জগতে আর দেখা যায় নাই ; এত
বড় মুগ্ধকারী রূপ, ভাব, যাগ অবাকমনোগোচরম্, যাগ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীচৈতন্য ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শুনা যায় মাত্র ;
আর আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পূর্ব পূর্ব অবতার পুরুষগণ
সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতেছি ।

শ্রীশ্রীঠাকুর আন্ধ আন্ধ পর্য্যন্ত 'লেখাপড়া' শিখিয়াছিলেন
মাত্র । কারণ বাল্যকালেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সংসারে
নানা অভাব অনটন আসিয়া পড়ে । যদিও এ মানুষ আন্ধ
আন্ধ পর্য্যন্ত শিখিয়াছিলেন, তথাপি ইঁহার সরল স্ফুটন ও
সুমার্জিত ভাষায় বেদ-বেদান্তের গূঢ় রহস্য, জটিল দর্শনের সরল
সহজ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া খ্যাতিলাভ পণ্ডিতমণ্ডলও বিস্মিত ও
স্তুতিভিত হইয়া যাইতেন । তাঁহার স্মরণ শক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে,
শ্রীশ্রীহরিলালানুত গ্রন্থখানি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অনর্গল ভাবে
আদ্যন্ত পাঠ করিয়া যাইতে পারিতেন । যে কোন্ বিষয়ে একটু

উত্থাপন হইয়া গেলেই তাহার সমস্ত টুকুই সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন ! যেন সর্বজ্ঞাতা, সর্ব কৰ্ম কৰ্ত্তারূপেই এ নিঃশব্দ দেশে পূর্ণশক্তি লইয়াই এবার প্রভু আসিয়াছিলেন । শ্রীশ্রীঠাকুরকে ও কিছু দিনের জ্ঞাত পরগৃহে চাকরীও করিতে হইয়াছিল । এইখান হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের কৰ্ম জীবনের আরম্ভ । কেমন করিয়া নিজের জীবন বিপন্ন ও তুচ্ছ করিয়া, ব্যাত্রেয় মুখে সঁপিয়া দিয়া ও মনিবের কার্য্যোদ্ধার করিতে হয়, এই একাদশ বর্ষ বয়সেই তিনি তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন প্রদান করিয়া দাসত্বের আদর্শ, কৃতজ্ঞতার অক্ষয় জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন ।

ছয় মাসের মধ্যেই তাহার দাসত্বের শেষ হইল । তিনি সুরগ্রাম হইতে গৃহে ফিরিলেন । এই সময় কবিরসরাজ গোস্বামী তারক একদিন তাহার শ্রীমুখে—স্মিফ্ট সুগন্তীর সুরের একটি সুমধুর গীত শ্রবণ করিয়া এমনই মোহিত হইয়া যান যে, সেইদিন হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ছয় মাস কাল আপনার সঙ্গে সঙ্গ রাখেন এবং নানাবিধ গীত-বাদ্য ও শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন । পরে বাড়ীতে ফিরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষিকার্য্য, গোপালন ও মুদি দোকানের ব্যবসায় আরম্ভ করেন । এই ভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া যাওয়ার পরে হঠাৎ একদিন তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং ৫১৬ বৎসর কাল ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্য্যটন ও বহুভাবে বহু সাধু মহাপুরুষের সঙ্গ করিয়া আবার বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন । বাড়ীতে আসিলে আত্মীয় স্বজনে দিবাঙ্কের জ্ঞাত কথা দেখিতে লাগিলেন ।

কিন্তু কোন্ কন্যাই তাঁহার পছন্দ না হওয়ায়, একদিন স্বয়ং ঘটকের সঙ্গে গিয়া ৬গোলোকটাদ গোস্বামী বংশ সম্বৃত্ত ৬পূর্ণচন্দ্র গোস্বামীর চতুর্দশ বর্ষীয়া কন্যা শ্রামতী বিরজা দেবীকে দেখাইয়া দেন । এবং শুভদিনে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সে উক্ত কন্যার সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ-পরিণয় কার্য সম্পন্ন হয় । বিবাহের পর হইতেই পুনঃ পুনঃ ভাবস্থ হইয়া পড়িতে থাকেন । এক সময় বর্ষা কালে জমিতে জনৈক কৃষকের “বারাসে” গান শ্রবণ করিয়া জলের মধ্যেই ভাবস্থ হইয়া ডুবিয়া থাকেন । দৈব ক্রমে জনৈক পথিক তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া নিজের নৌকায় তুলিয়া বাটীতে রাখিয়া যান । এইভাবে কয়েক বৎসর থাকিয়া আবার দেড়বৎসরকাল নিরুদ্দিষ্ট হইয়া মল্লধীপ, গঙ্গাঘাট, কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থ স্থানে গিয়া নানাভাবে সাধু সহবাসে কাটাইয়া আসেন ।

১৩১৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিবস রাত্রিকালে পাঁচ কাহনীয়া হইতে দেবাসুর যাইবার পথে রাত্তিরে “আলোক-ডাঙ্গা”র শ্মশান ভূমিতে এক অপূর্ব দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া সমস্ত রাত্রিই সেইখানে সমাধিস্থ হয়ে থাকেন । অবশেষে রাত্রিশেষে শবদাহকারীদের বিকট হরিশবনি শ্রবণে সমাধি ভঙ্গ হইয়ায় গৃহে ফিরিয়া আসেন । এবং পুনঃ পুনঃ ভাবস্থ হইয়া পড়িতে থাকেন । এই সময় অষ্টবিংশতি প্রকারের দিব্যভাব সমূহ তাঁহাতে সর্বদা লাগিয়াই থাকিত ! অহর্নিশিই ভাবের ঘোরে উন্মাদের মত পড়িয়া থাকিতেন । অতঃপর এইভাবে

লইয়া কলপুর গিয়া শ্রীশ্রীঅম্বিকা দেবী, শ্রীকৈলাস স্বামী, তত্ত্ব
বিজ্ঞবর প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হইলেন। পূর্বেরও ইচ্ছাদের
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভাব ছিল। এখন উহা আরো প্রখ্যাত হইয়া
প্রকাশ হইল। এখন হইতে সदा সর্বক্ষণ শ্রীশ্রীঅম্বিকাদেবীর
শ্রীশ্রীমনসা তলায় মধুর শ্রীহরি নামে মাতোয়ারা হইয়া পাগল
হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। ঐ অবস্থায় বাহাকে যখন স্পর্শ
করেন, সেই-ই ভাবস্থ হইয়া পড়িতে থাকে। বহু মৃতকল্প
মুমূর্ষু রোগী তাঁহার পুনঃস্পর্শে নবজীবন লাভ করে।
এখন হইতে একেবারেই আপনার খেয়ালে চলিতে ফিরিতে
লাগিলেন। কাহারও কথায় কণ পাত নাই। ভাদ্রমাসে
ভেল্লাবাড়ী হইতে ত্রৈলোক্যনাথ, অগ্নিনীকুমার, অতুল কৃষ্ণ ও
সানপুকুরিয়ার নীলকমল এই চারিজন আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে
তাঁহাদের অঞ্চলে লইয়া যান। এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে
সুরিতে থাকেন।

উক্ত বৎসর পৌষমাসে কলপুর হইতে ভেল্লাবাড়ী যাইবার
সময় ভক্তগণের মধ্য হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকবার অদৃশ্য হইয়া
যান, আবার হঠাৎ আদ্রিয়া উপস্থিত হন। কখন উলঙ্গ, কখন
বা অর্দ্ধোল্লাবস্থায় পাগলের ভাব মত করিতে করিতে চলিতে
থাকেন। কখন বা পথের গরু বাছুরকে ধরিয়া কোল দেন, তাঁদের
পিঠে চড়িয়া বসেন, কখন, বা বিজ্ঞবরের স্বন্ধে উঠিয়া চলেন।
কখনও বা গালাগালি বকাবকি করেন। এই সব দেখিয়া শ্রীকৈলাস
স্বামী তাঁহাকে পাগল বলিয়া, “পাগলটান” বলিয়া ডাকিতে

আগিলেন। সেই হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাগলচাঁদ নাম প্রচার
 হইয়া গেল। আর এতদেশের ভক্তগণের অতিপ্রিয় অতি
 প্রিয়ের ডাক “পাগলচাঁদ” নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত।
 উক্ত বৎসর মাঘী পূর্ণিমার পূর্ব পর্য্যন্ত তাঁহার কয়েকজন
 অন্তরঙ্গ ভক্ত ভিন্ন সাধারণের মধ্যে তিনি অপ্রকাশই ছিলেন।
 উক্ত বৎসর ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৯ই ফাল্গুন শুক্রবার মাঘী পূর্ণিমায়
 ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইয়া দেবাসুরে ভক্ত-সন্মিলন ও
 শ্রীশ্রীদীনবন্ধু প্রকাশ মহোৎসব করেন। ঐ মহোৎসবে শত শত
 নরনারীর মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর সু-প্রকাশ হইয়া স্বীয় ভাব জগতে
 প্রকাশ করিলেন। যে যে দায় লইয়া আসিল, যে যে যাহা
 যাহা পাওয়ার আশায় আসিল দয়াল পাগলচাঁদ বাঞ্ছাকল্পতরু
 হইয়া তাহাদের তত্তৎ প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। এবং প্রকাশ
 করিলেন—“আমিও মানুষ, তোমরাও মানুষ, সকলেই মানুষ
 এই মানুষ রূপেই ত ভগবান! কোন ভয় নাই। মাঠে মাঠে!।
 আমি আসিয়াছি, আমি আছি! আমাকে বিশ্বাস কর, নির্ভর
 কর, সঁপে দাও! আমি তোমাদের ভালমন্দ পাপ তাপ সব
 গ্রহণ করলাম। সর্বদা আমার নাম নিয়ে কাজ কর। জ্ঞানলাভ
 কর। সত্য ও বীর্য্যবান হও। সকলের মধ্যে সমস্ত বস্তুর
 মধ্যে আমাকে জেনে সকলকে সবতাকে ভালবাস প্রেম
 কর। প্রেম প্রেম প্রেমই সব। সকলেই সমান। সকলেই
 মুক্ত। তাঁর রাজ্যে আবার বন্ধন কিরে? সকলেই সকলের
 ভাই, ভগ্নী, বন্ধু! আমিও সকলের বন্ধু। বলো বন্ধু—“জয়:

দীনবন্ধু” আর ভয় নাই ! জগতের দীনগণই আমাদের বন্ধু ।” ঐ দিন হইতেই তাঁহার অপূর্ব ভাবরাশি জগতে বিস্তার হইতে আরম্ভ হইল । বহুদূর-দূরান্তর হইতে ধনী জ্ঞানী, ধীন-দরিদ্র, আর্থী আতুর হিন্দু মুসলমান জাতিবর্ণ নির্বিশেষে এক মানবজাতি হইয়া আসিয়া, তাঁহার অমূল্য অহৈতুকী দয়া লাভ করিয়া ধন্য হইতে লাগিল । যে আসিল, এ আপন ভোলা প্রেমের পাগল কান্দালের ঠাকুর দীনের বন্ধু তাহাকেই বন্ধু বলিয়া কোলে লইলেন, বুকে ধরিয়া প্রেমালিঙ্গন দিলেন । দিকে দিকে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তা উডডান হইল । শঙ্খ শিঙ্গা কাংস, খোল-ঢোল, জয়ডঙ্কা মৃদঙ্গের সঙ্গে মঙ্গলধ্বনি হুলুধ্বনি সমভিব্যাহারে জগন্মঙ্গল “জয় দীনবন্ধু” ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া সেই ভাব রাজ্যের সোণার মানুষ রাজরাজেশ্বরের প্রকাশ বার্তা দেশে দেশে ঘরে ঘরে ঘারে ঘারে বিঘোষিত হইল । বিখের মহাপরিবর্তন ভাব—জাগরণ যুগের উদ্বোধন সংজ্ঞাপিত হইল ।

সমস্ত বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা, সমাজের ভেদাভেদ উঠিয়া গিয়া সকলেই সমান-মানুষ, তাঁহারই, সন্তান, ভাই ভগ্নী—বন্ধু ভাব প্রবর্তিত হইল । বহু ঔক্ত, সিদ্ধপুরুষ, মুক্তপুরুষ, জীবমুক্ত মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহার অমিয় সদানন্দময় সঙ্গে মাতিয়া রহিল ; কেহ কেহবা বিভিন্ন প্রদেশে গিয়া ঐ ভাব বিস্তার করিতে বাহির হইয়া গেল । এতদেশে তাঁহার ভক্ত—পণ্ডিত শ্রীচরণ রায়, গণেশচন্দ্র হীরা, গায়ক কবি গঙ্গাচরণ সরকার, মহাত্মা উমাচরণ ঠাকুর, শুক চাঁদ জুমদার, সখিচরণ মণ্ডল, গায়ক, কবি

রজনীকান্ত সরকার, রসকবি কুমুদকান্ত দত্ত, উদ্ধবচন্দ্র মজুমদার, 'বীরকানাথ' সরকার, রজনীকান্ত দাশ, যজ্ঞেশ্বর রায়, সাধু রাজকুমার রায়, ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ দাস, ডাক্তার শ্যামলাল পোদ্দার, রসিক, শশী, কানাই কত বলিব,—দেবেন্দ্রনাথ খাঁ, নকুলচন্দ্র মিত্র, নবকৃষ্ণ শীল, ত্রৈলোক্য নাথ কুণ্ডু, সর্বেশ্বর রাজবংশী, বিষ্ণুদাস মিয়া, মহানন্দ ঢালী, রামদয়াল ঋষি, নৃপেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কালীকুমার মজুমদার, ডাক্তার গনেশচন্দ্র মণ্ডল, জলধর বাণী, সুরেশচন্দ্র ঠাকুর, সর্বভাগী মহাবীরের অবতাব স্বামী রুদ্রানন্দ, মহাদেব বিশ্বাস, মনোহর ঢালী, নেপাল চন্দ্র বিশ্বাস, মৌলবী লৎফল হাকিম, পণ্ডিত পতিরাম রায়, এই মিশনের সভাপতি স্বামী অমূল্য কৃষ্ণ, চন্দ্রাবলী দেবী, প্রীতিময়ী বিশ্বাস, সরোজিনী মজুমদার, রাসমণি দেবী, মহারানী দেবী, সীতা দেবী, চন্দ্রকান্ত মণ্ডল, মমতাজ মোল্লা, কামিনী বিশ্বাস, সৌরেন্দ্র কুমার ভাট্টা, ভুবনমোহন বসু, কাঙ্গালীধর বিশ্বাস প্রভৃতি শত শত নরনারীই তাঁহার জন্ত “ঘর কৈল বাহির, বাহির কৈল ঘর” । সফলের এ পাগলচাঁদ সকল জাতির সকলের ঘরেই যাইতেন, সকলের সঙ্গেই পানাহার করিতেন, সকলকেই বন্ধুর মত ভাল বাসিতেন, এ যেন দ্বীপকৃষ্ণ, যুবা বৃদ্ধ শিশু সকলেরই সকল অবস্থায়ই সমান দরদী । যে গৃহেই যখন যাইতেন, পাখানা পরিষ্কার হইতে কোঠার আসবাব সাজান পর্য্যন্ত সর্ববিধ কর্মই কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সুন্দর সুশৃঙ্খলরূপে সুসজ্জিত করিয়া, শাস্ত্রের বাসে, উপযোগী স্থান

করিয়া, মানুষের মত মানুষ হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়, তাহা সহস্বে সম্পাদন করিয়া বাসগৃহেরও আদর্শই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রতি মানুষের—বালযুবাবৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ প্রত্যেকেরই প্রাতরুত্থান হইতে পুনঃ নিদ্রাকাল পর্য্যন্ত এক এক করিয়া সমস্ত দৈনন্দিন কার্য্য নিয়মিতভাবে নিজে করিয়া ও ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া এবং ভক্তগৃহে যাইয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কোণের বি, বৌ হইতে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, পণ্ডিত মুখ, ধনী, দরিদ্র সকলকেই আপনার হইতে আপনার করিয়া তাহাদের প্রিয়তম আশ্রয়ভাবে, বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে তাহাদের হইয়া, তাহাদের মধ্যে যাইয়া তাহাদের মধ্যের সর্ব্বপ্রকারের কু-সংস্কার স্বয়ং সম্মুখে থাকিয়া দূর করাইয়া মুক্তির পথ, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের মুক্তির পথ সু-প্রশস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে এত সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে যে তাহা বলিতে গেলে দিন-মাস-বৎসর লাগিয়া যায়। এবং অনেকে আমাকে মস্তিষ্ক বিকৃত বলিয়া উপহাস করিতেও বোধ হয় দ্বিধা বোধ করিবে না। কিন্তু “সত্য চির সত্য, ব্যক্ত স্বীয় মহিমা” ১ তাই দুই একটি ঘটনা এখানে না প্রকাশ করিলে তাঁহার অমূল্য জীবনের আভাষটুকুও বাকী থাকিয়া যাইবে। তাঁহার জন্মের দুই চারিদিন পর একদিন পান্নাদেবী দ্বিপ্রহরে শিশু ঠাকুরকে লইয়া একাকী আঁতুড়ঘরে ঘুমাইয়া অছেন। কিছুক্ষণ পরে আগিয়া দেখেন—ঘরের চাঁলার ছিদ্র দিয়া প্রথর রৌদ্রতাপ আঁগিয়া শিশুর মুখে লাগে দেখিয়া একপ্রকার সর্প

বির্ণাল খবল ফণা বিস্তার করিয়া শিশুকে রোদ্র হইতে রক্ষা
করিতেছে। ‘আর তাহার সঙ্গে শিশু ঠাকুর যেন ঈর্ষিয়া হাঁসিয়া
খেলা করিতেছেন। পাম্মাদেবী দেখিয়াই ভীত হইয়া যেই
ধাত্রীকে ডাকিলেন, অমনি সর্পটি যেন কোথায় অদৃশ্য হইয়া
গেল, আর খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না। পাম্মাদেবী স্বয়ং একথা
আমাদের কতবার বলিয়া জানাইয়াছেন যে, “এ পাগল
সামান্য পাগল নয় রে! এ সেই ব্রজের পাগল! জন্মকাল হতেই
দেখে দেখে বুঝে আসছি।” আর একবার আমড়িয়া হইতে
আসিতে পথে শ্রীকৈলাস স্বামীর সঙ্গে আলোচনা হইতেছিল
“তঁার উপর বিশ্বাস কর, নির্ভর কর, তিনি সব করে নেবেন।
তিনি সব কর্তে পারেন। তিনি দয়াময়, না চাহিতেই যার যা
দরকার দিয়ে থাকেন। কিছু কত্তেও হয় না। শুধু নির্ভর,
নির্ভর কত্তে পায়েই সব অভাব চলে যাবে।” শ্রীকৈলাস স্বামী
শ্রীশ্রীঠাকুরের একথায় বিশ্বাস করিতে ‘না পারিয়া বলিলেন--
আচ্ছা, যদি তাহাই হয়, তবে এই মাঠের মধ্যের শূন্য আমড়িটায়
বসে আমরা তাঁর নাম করি, তাঁকে সবসঙ্গে দিয়ে বসে থাকি,
দেখি তিনি আমাদের পানাহার করান কেমন করে?” শ্রীশ্রীঠাকুর
ভাবে উপরে চলিতেন,—চলিতেছেন—যেই এই কথা অমনি
সন্তোকে উঠিলেন সেই আমড়িটায়, পাগলের পাগলামী আরম্ভ
হইয়া গেল। পাগলটান এক আত্মবুদ্ধি উঠিয়া ডালে বসিয়া
গান ধরিলেন। ৬০।৭০ জন সঙ্গী ৮ এক একজন এক এক
ডালে, কেউ কেউ ডায়া কেউ বসিয়া, কেউ গাইতে লাগিলেন

কেউ নাচিতে লাগিলেন, কেউ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কেউ লক্ষবাক্ষ দিতেছেন। কেউ আত্মশাখা ভাঙ্গিয়া, শ্রীশ্রীঠাকুর ও ভাবোন্মত্ত ভক্তগণকে বাতাস করিতেছেন, ছায়া দিতেছেন। চৈত্র মাসের দ্বিপ্রহর। রৌদ্র কিম্ব খরিয়াছে। সেই ভিটা হইতে গ্রাম এক মাইল দেড় মাইল দূরে। জনমানব নিকটে নাই, জল ও নাই। কাহারও ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই। বাহ্যিক জ্ঞান ও নাই। তাহারা যেন একজগতের নয়, কোন এক জগতের। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল শ্রীশ্রীঠাকুরের গানে ও ভক্তগণের ভাবে আকুল হইয়া গ্রাম হইতে দলে দলে মেয়ে পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ সব খাবার লইয়া আসিতেছেন। তাহাদের আগমনে আনন্দ আরোও বাড়িয়া গেল। অবশেষে বেলা ৩টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ভাব সামলিয়া বাহ্যজগতে দৃষ্টি করিলেন এবং ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইয়া সকলকে শাস্ত করিলেন। অন্তঃপর গ্রামবাসীগণের কাতর অনুরোধে তাহাদের আনীত খাদ্যবস্ত্র দ্বারা মহাপ্রসাদ তৈয়ারী করিয়া সকলে মিলিয়া গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। সেইদিন হইতে সকলে ধুখিল—শিশু জন্মবার পূর্বে তাহার খাদ্য মাতৃস্তন্য স্বাভাবিক নয়, উহা তাঁহারই অহৈতুকী দয়ার দান।

আর একদিন, ১৩২৫ বঙ্গাব্দে পণ্ডিত গনেশচন্দ্র হীরার বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মাক্ষরী মহোৎসব হয়। স্মরণীয়। কীৰ্ত্তন হইতেছে। স্বামীজি দক্ষিণে এবং শ্রীশ্রীঠাকুর বামে বসিয়া নিতাই গোপেন্দ্র ভাবে বিভোর হইয়া বসি অস্বাভাবিক ব্রাহ্ম তুলিয়া

হুলিতেছেন । ভক্তগণ ভক্ত বিপিনের রচিত গানের “মালা
 দুলাছে প্রেমের হাওয়ায়, পাগল চাঁদের গলায় চাঁদের মালা
 ছাচ্ছে প্রেমের হাওয়ায়” এই অংশ গাহিয়াই কুমুর দিয়াছেন ।
 সকলে ভাবে বিভোর । সকলেরই ঠাকুর স্বামিজির প্রতি দৃষ্টি
 নিবদ্ধ । ইহার মধ্যে হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের গলায় হুলিত বকুল
 ফুলের মালাটি আপনা আপনি উঠিয়া গিয়া গনেশচন্দ্রের গলায়
 গিয়া লাগিল ! গনেশচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্শ্বদেশে ১০।১৫ জন
 ভক্তের পিছনে বাতাসের বিপরীত দিকে বসিয়া ছিলেন । এই
 দৃশ্য দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত—বিস্মিত ও ভাবিত হইয়া গেলেন ।
 এখনো ঐ অঞ্চলের লোকেরা ঐ মালার কথা আলোচনা করিয়া
 থাকে । এক্রূপে যে নিতাই কত কত নূতন নূতন আলৌকিক
 অদ্ভুত অপূর্ব ঘটনা সকল হাঁটিতে বসিতে খাইতে শুইতে, এমন
 কি শোচে যেতেও হইত তা কে বলিয়া শেষ করিবে ? কত মুমূর্ষুকে
 বাঁচাইলেন, কত অচেতনকে চেতন করিলেন । এ সহজ ভাবের
 পাগল মানুষের জলে-স্থলে-নভে, অন্তরে বাহিরে সর্বত্র অবাধ
 গতিতে অপূর্ব অপূর্ব ভাবের কত খেলাই দেখিয়াছি । একেই
 বলে মানুষরূপে ভগবান ! একেই বলে অবতার শক্তি । “একেই
 বলে ক্ষুদ্রচেতন শক্তির মধ্যে পূর্ণ চৈতন্য শক্তির বিকাশ ।

— শ্রীশ্রীঠাকুর মদ গাঁজা ভাং প্রভৃতি নেশাকর বস্তুর বড়ই
 বিরোধী ছিলেন । তাঁহার সম্মুখে কেহ, কি তাঁহার ভক্তের মধ্যে
 কেহ কখনো স্পর্গ করিতে পারিত না । তিনি বলিতেন, “নেশা
 একমাত্র তাঁহাতেই করবে । ভগবানেই করবে । সেইই সর্ব

নেশার আকর । তাঁতে নেশা করলে আর ছুটেবে না । অল্প নেশা সব তুচ্ছ হ'য়ে যাবে ।" . আর বিশ্রাম বার রবিবারে তন্ত্র দিগকে বিশেষতঃ যে সকল ভক্ত গৃহী, সকামী তাঁহাদিগকে মাংস মাংস খাইতে নিষেধ করিতেন । এবং সংযমী হইয়া পবিত্রভাবে তাঁহার চিন্তা, তাঁহার নাম করিতে বলিতেন । ইহাতে সর্পভয়, অকালমৃত্যুর ভয়, অগ্নি জলভয়, পৈশাচিক ব্যাধি প্রভৃতির ভয় থাকিবে না । তাই দেখা গিয়াছে—১৩২৬ সালের প্রবল ঝড়িকায় তাঁহার ভক্তঘরের একটি বিড়াল কুকুর এমন কি একটি পক্ষী পর্য্যন্তও মরে নাই । ইহা আমি বহু অনুসন্ধান—অন্বেষণ করিয়া বাহির করিয়াছি । মনে করিবেন না যে, আমরা সহজে বিশ্বাসী হইয়াছি, পুনঃপুনঃ যাচাই করিয়া করিয়া তবে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি ।

ঊনবিংশতি শতাব্দীতে যে মানুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে আসিয়া রাজধানী কলিকাতা নগরীতে বহিমুখী গतिकে সজোরে টানিয়া অন্তিমুখী করিয়া দিয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে বাঁচিবার পথে আনিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যে মানুষ কৃষ্ণ বুদ্ধ গ্রীষ্টরূপে পূর্ব পূর্ব যুগে আসিয়া এক একবার যুগ চক্রের গতি প্রত্যাবর্তন করিয়া গিয়াছিলেন, সেই চক্রধারীই এবার বাংলার মধ্যে আসিয়া সমগ্র পতিত জাতির যুগ যুগান্তরের নিষ্কৃতিতে উদ্ধমুখী করিয়া গেলেন । মানুষে মিশিয়া মানুষ হইয়া এমন সহজভাবে মানুষের লোলা বিনিই দেখিয়াছেন, তিনিই প্রস্তু হইয়াছেন, জীবন, জনম সার্থক করিয়াছেন ।

তৌহার অহৈতুকী করুণার কথা মনে পড়িলে এখনও আনন্দে ভাবে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে । যে যখন যে দায়, যে অভাব আসিয়া জানাইয়াছে, ঝড়বৃষ্টি, শীতাতপ, রাত্রিদিন সময় অসময় তুচ্ছ করিয়া, এমন কি নিজের অন্তঃশরীর লইয়াও তখনি ছুটিয়াছেন—তাহাদের স্নেহের জন্ম । শত শত রোগী শোকা, দীন দুঃখী প্রত্যহ বিদায় হইত । নিজে ঋণী হইয়াও দীনদরিদ্রের সেবা করিয়া কি আনন্দই পাইতেন । যেন সমস্ত জগতের জন্ম, সমস্ত দেওয়ার জন্মই প্রভু এবার পাগল হইয়া আসিয়াছিলেন । দেখিলে মনে হইত সেই অদ্ভুত শরীরের মধ্যস্থিত অদ্ভুত সত্ত্বাটী যেন সমস্ত জগত ব্রহ্মাণ্ডেরই কেন্দ্র স্বরূপ । দীনদরিদ্র, মূর্থ আর্ত, নিশ্চেষ্ট নির্ঘাতীত ও বন্ধ-ভীতেরই মুক্তির জন্ম—উদ্ধারের জন্ম, ত্রাতারূপে পিতৃমাতৃরূপে বন্ধুরূপে সহজ ভাবের আবরণ পরিয়া আসিয়াছিলেন । দীনদরিদ্রের জন্ম জগতে এমন ভাবে কেউ আর কঁাদে নাই । এমন খোলা প্রাণ দেওয়া ভাবে কেউ আর তাদের মধ্যে মিশে নাই । এক মাত্র প্রভু যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন—“দীন যাহারা তাহারাষ্ট ধন্য । কেন না, স্বর্গ রাজ্য তাহাদেরই” । কিন্তু এ সহজভাবে পাগল মানুষ তাহাদের বন্ধু হইয়া কোল দিলেন, প্রেম বিলাইলেন, আপনার করিয়া সঙ্গে মিশাইয়া লইলেন । প্রভু যীশুর প্রধান ভক্তগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নিম্নশ্রেণী জাতির সম্প্রদায়ের । আর ইহারও প্রত্যেকেরই প্রান্তে হার্ডি মুচি ডোম অসিল আশ্রয়

পাইল, ত্রাণ কায়স্থ বৈজ্ঞানিক আসিল, আশ্রয় পাইল, ধোপা
নাপিত প্রভৃতির বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু আসিল আশ্রয় পাইল, মুসলমান
খ্রীষ্টিয়ান আসিল আশ্রয় পাইল । ধনীদরিদ্র পণ্ডিত
মূখ নরনারী যেই আসিল সেই আশ্রয় পাইল । যে ধনের
আশায় আসিল সে ধন পাইল । যে জনের আশায় আসিল
সে জন পাইল, যে জ্ঞানভক্তি, কৰ্ম্ম-মুক্তি যে যে প্রকারের
আশা লইয়াই আসিল সকলে তত্তৎ ভাব পাইয়া সমস্ত অভাব
দৈন্য ভুলিয়া গেল, ধন্য হইয়া গেল এবার সকলকে পূর্ণ
করিতেই প্রভু পূর্ণ রূপে প্রকাশ হইয়াছিলেন ।

শ্রীশ্রীঠাকুর কৃষ্ণ-বুদ্ধ গীট, আল্লা-ব্রহ্মা কালী, দুর্গা-মনসা
চণ্ডী হরি সকল দেব দেবীই মানিতেন । এক এক সময়
তঁাহাদের এক এক ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন । আবার
কাহাকেও মানিতেন না । একথা বলিলেও মিথ্যা হয় না ।
কারণ তিনি সর্ববক্ষণই আপ্নাতে আপ্নি মাতোয়ারা হইয়া
থাকিতেন । সর্ববয়স হইয়া থাকিতেন ; যখন যে ভক্ত যে
ভাব লইয়া নিকটে আসিতেন, সে ভক্তে তঁাহার সেই ভাবেই
দর্শন পাইয়া তস্যয় হইয়া যাইতেন । তাইত এমামুখে “ধ্বষ্টিগানে
ভাবে খুঁট, বোঁকে ভাবে বুদ্ধ, মোসলেমে কহে আল্লা তুমি
নিত্যশুদ্ধ ।” বলিয়া নিত্য স্তব স্তুতি করিতেছেন । এ নিত্য-
শুদ্ধ ঠাকুর সর্বরূপই ধ্যান করিতেন, জগতের সর্ববিনাম শ্রবণেই
ভাবস্থ হইয়া পড়িতেন । তিনি শিশুর নিকট, শিশু, বৃদ্ধের
নিকট বৃদ্ধ, যুবীর নিকট যুবা, পুরুষের নিকটে পুরুষ, আবার

নারীদের নিকট নারীরূপে প্রকাশ পাইতেন। বস্তুতঃ এ সর্বব্রহ্মসী
মানুষ “কি যেন কি”ই ছিলেন। যে যেমন তাহার কাছে
কেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইতেন। এমন
বাল-গাভীরা ভাবের সমাবেশ আর দেখা যায় নাই। সকলে
যেমন তাঁহার ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত তেমন আবার স্নেহ
ভালবাসায় পুত্রকন্যাবৎ ভাবিয়া মধুর বাৎসল্য স্নেহ রসে পরি-
প্লুত হইয়া যাইত। একাধারে শ্রীশ্রীঠাকুরে গৃহী, ত্যাগী, সন্ন্যাসীর
ভাব, রাজসিক সামাজিক ধার্মিকের ভাব, আবার উহাতে সর্ব
প্রকারের সংস্কারের ভাবও সর্বদা প্রকাশ পাইত। কৰ্ম্মে
এমন ব্যাপ্ত থাকিতেন যে, দিবাবাত্র মাত্র ৩৪ ঘণ্টার বেশী
বিশ্রাম কি নিদ্রায় থাকিতেন না। অধিকাংশ রাত্রিই কীৰ্ত্তনে
কথনে আনন্দে কাটাওয়া দিতেন। জগতে নিকাম কৰ্ম্মযোগ
অকামনা প্রেমভক্তি এবং সত্য চৈতন্যশক্তি প্রদান করিতেই
এবার এ অপূর্বভাবের লীলা। লীলাশেধে ভাবের মানুষ তাঁহার
স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য ভাব গ্রহণ করিলেন। জগতের
স্থূলাবলম্বী জীবের সেই দুঃখের দুর্দিন বাংলা ১৩৩১ সালের ১০ই
আষাঢ় সোমবার।

বহু যুগযুগান্তরের অবজ্ঞাত উপদ্রুত শিক্ষালোক বর্জিত
অনুন্নত সমাজের মধ্যে শিক্ষালোক প্রবেশ না কবাত্বে হিন্দু
সমাজের প্রধান অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। এ
অনুন্নত সমাজের মধ্যে সর্বতোমুখী শিক্ষা প্রচলিত না হইলে
সমাজ অঙ্গ যে ধ্বংসপুষ্ট হইবে না। তাই এতদেবের অনুন্নত

সমাজের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিধান ও সেবাস্বার্থ জাগরুক করিয়া দীনদরিদ্র ও আর্ন্তিক সেবাবারা সর্ববিধ মুক্তির উপায় করিয়া দিবার জন্য এবং বাহাতে তাঁহার অনুগামী সেবকগণ ভোগ-লালসা পরিত্যাগ করিয়া দেশ ও দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার সুযোগ পায় তদুদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি কেন্দ্রীয় মঠ ও মিশনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া রাহুখড়ের সেই “আলোক ডাঙ্গা”য়ই এই মঠ ও মিশনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন । তাই আজ আমি হৃদয়ের সহিত শ্রীশ্রীদীনবন্ধু মঠ ও মিশনের কল্যাণ, তাঁহার গৃহান্তরণ এবং অভাগত সাধুসজ্জনগণকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায়ই আহ্বান করিতেছি—ওগো, বর্তমানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর । যা অতীত হয়ে গেছে তা গেছে, ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তা কে জানে ? অতএব বর্তমানের কার্য বর্তমানে ক’রে যাও । বর্তমানের ভাব বর্তমানে গ্রহণ কর । বর্তমানের হাওয়ায়, জীবনতরীর পাল টেনে দাও । সহজভাবে জীবন সাফল্য কর । ইহাই বর্তমানের ধর্ম । ওম্ !*

শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

* ১৩১৫ বঙ্গাব্দের মাঘা পূর্ণিমায় ধারেকানগর মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকাশ মহোৎসবে ভক্তসম্মেলনীতে দেশ সেবায় সর্গত্যাগী মহাপুরুষ ঠাকুর মহারাজ নগেন্দ্রনাথের শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধীয় বক্তৃতা হইতে গৃহীত ।

